# গ্রীমের রূপকথা



ন্যাশনাল পাবলিশার্স

# গ্রীষ্মের রূপকথা



রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৫

প্রকাশক :

গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :

রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিউ টাইমস প্রিন্টার্স
২০৬ বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

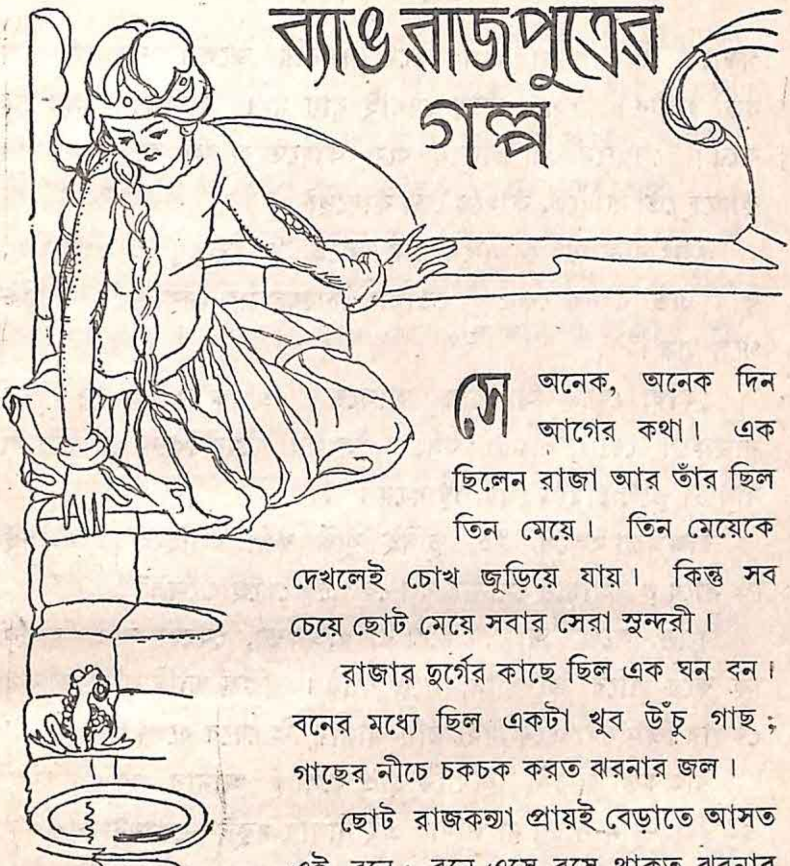


পাঁচ টাকা

তুতুমণি আর তপুকে

# সূচী

# ব্যাঙ রাজপুত্রের গল্প



সে অনেক, অনেক দিন আগের কথা। এক ছিলেন রাজা আর তাঁর ছিল তিন মেয়ে। তিন মেয়েকে দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সব চেয়ে ছোট মেয়ে সবার সেরা সুন্দরী।

রাজার দুর্গের কাছে ছিল এক ঘন বন। বনের মধ্যে ছিল একটা খুব উঁচু গাছ; গাছের নীচে চকচক করত ঝরনার জল।

ছোট রাজকন্যা প্রায়ই বেড়াতে আসত এই বনে; বনে এসে বসে থাকত ঝরনার ধারে। বসে বসে যখন আর ভাল লাগত না তখন একটা সোনার বল নিয়ে শুরু করত লোফালুফি খেলা।

একদিন হয়েছে কি, রাজকন্যা সোনার বলটা ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আর লুফতে পারল না। বলটা এসে পড়ল রূপোলী ঘাসের ওপর; তারপর গড়াতে

গড়াতে গিয়ে পড়ল ঝপাং করে ঝরনার জলে। ঝরনার জল বড় গভীর। তলা পর্যন্ত দেখাই যায় না। রাজকন্যা আর কি করে! সেখানে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে লাগল হাপুস নয়নে। কাঁদছে তো কাঁদছে, কাঁদছে তো কাঁদছেই।

হঠাৎ রাজকন্যা শুনল কে যেন বলছে, "রাজকন্যা, ও রাজকন্যা, তুমি এত কাঁদছ কেন? তোমার চোখের জল দেখলে যে পাথরও গলে যায়।"

কোথা থেকে আওয়াজ আসছে? এদিক ওদিক তাকিয়ে রাজকন্যা দেখে একটা ব্যাঙ। জলের মধ্যে থেকে সে নোংরা মাথাটা তুলে চাইছে পিট্‌পিট্ করে।

রাজকন্যা বললে. "ও, তুমিই বুঝি কথা বলছিলে? কাঁদছি কি সাধে? আমার সোনার বল যে পড়ে গেছে জলে।"

ব্যাঙ বললে, "আহা, কেঁদো না রাজকন্যা, কেঁদো না। বলটা কি করে পাবে তা আমি বলতে পারি। কিন্তু আমি যদি তোমার খেলার জিনিসটা এনে দিই, তুমি আমায় কি দেবে বলো।"

রাজকন্যা বললে, "তুমি কি চাও বলো? আমার এই পোশাক, এই হীরে-চুনি-পান্না, না আমার এই মাথার মুকুট—কোন্‌টা চাও?"

ব্যাঙ ঘাড় নেড়ে বললে, "উঁহু, পোশাক, হীরে-চুনি-পান্না, মুকুট—এসবে আমার কাজ নেই। তুমি যদি আমায় ভাল-বাস, আমায় তোমার সঙ্গে ঘুরতে দাও, খেলতে দাও, তোমার টেবিলে বসতে দাও, তোমার রূপোর কাপে জল খেতে দাও, তোমার বিছানায় একসঙ্গে শুতে দাও—তবেই আমি তোমার সোনার বল এনে দেবো।"

রাজকন্যা বললে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি কথা দিচ্ছি, সব দেবো। তুমি বলটা এনে দাও তো।" তারপর মনে মনে ভাবলে, বোকা ব্যাঙটা কি যে বকবক করছে! ব্যাঙ কি আবার মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে! ও থাকবে জলের মধ্যে ব্যাঙেদের সঙ্গে।

যেই না রাজকন্যা কথা দিয়েছে অমনি ব্যাঙটা টুপ করে ডুব দিল জলে। একটু পরেই আবার সোনার বলটা মুখে করে উঠে, বলটা ছুঁড়ে দিল ঘাসের ওপর। রাজকন্যার খুশি আর ধরে না। বল নিয়েই তো দে ছুট্।

রাজকন্যা ছুটছে দেখে ব্যাঙ চেঁচিয়ে উঠলো, "ও রাজকন্যা, থামো, থামো, থামো। আমায় তোমার সঙ্গে নাও। আমি কি আর তোমার মত অত জোরে ছুটতে পারি!"

কিন্তু চ্যাঁচালে কি হবে। রাজকন্যা ওর কথা কানেই তুলল না। ছুটতে ছুটতে বাড়ি চলে গেল, ভুলে গেল ব্যাঙের কথা। মনের দুঃখে ব্যাঙ আবার ডুব দিল ঝরনার জলে।

পরের দিন রাজকন্যা ছোট্ট সোনার থালায় খেতে বসেছে। পাশে বসে খাচ্ছেন রাজা মশাই। এমন সময় বাইরে শ্বেত পাথরের সিঁড়িতে শোনা গেল—থপ্ থপ্, থপ্ থপ্ আওয়াজ। আওয়াজটা একটু একটু করে ওপরে উঠে এল। তারপর দরজায় টোকা পড়ল—টক্ টক্, ঠক্ ঠক্। গলার আওয়াজ শোনা গেল, "ও ছোট রাজকুমারী, দরজাটা খোল। আমায় ঢুকতে দাও।"

রাজকুমারী দেখতে গেল কে ডাকছে তাকে? তারপর দরজা

খুলে ব্যাঙকে দেখেই দড়াম করে দোর বন্ধ করে দিল। টেবিলে ফিরে এসে যখন রাজকন্যা বসল তখন তার মুখ একেবারে শুকিয়ে এতটুকু। রাজা দেখলেন রাজকন্যার বুক ধড়াস ধড়াস করছে। বললেন, "ব্যাপার কি মা, বাইরে কোন দৈত্য এসেছে নাকি?"

রাজকন্যা বললে, "না বাবা, দৈত্য নয়। একটা নোংরা ব্যাঙ।"

"ব্যাঙটা কি চায়?"

রাজকন্যা বললে, "বাবামণি, কাল ঝরনার ধারে খেলার সময় আমার বলটা ঝরনার জলে পড়ে গিছল। আমি কাঁদছি দেখে ব্যাঙটা বলটা এনে দিয়েছিল। আমি তাকে কথা দিয়েছিলুম তাকে আমার সঙ্গী করব। ও যে জলের মধ্যে থেকে উঠে আসতে পারবে, আমি ভাবি-ই নি। ও যে-করেই হোক জল থেকে লাফিয়ে উঠেছে। এখন চাইছে ভেতরে আসতে।"

এমন সময় দরজায় আবার ঠক্ ঠক্ আওয়াজ হল আর শোনা গেল গলার স্বর ঃ—

"ঝরনা ধারায় গাছের ছায়ায়
কথা দিয়ে ভুললে কি?
ও রাজকন্যা, দুয়ার খোল,
আমার কথা শুনলে কি?"

রাজা বললেন, "কথা যখন দিয়েছ, কথা তো রাখতেই হবে মা। ওকে ঢুকতে দাও ভেতরে।"

রাজকন্যা আর কি করে, দরজা খুলে দিল। ব্যাঙটা লাফাতে

লাফাতে এল একেবারে চেয়ারের কাছে। বললে, "এবার আমায় ওপরে তোল।"

রাজা হুকুম করলেন, "ওকে ওপরে তোল।"

রাজকন্যা যেই না ব্যাঙকে চেয়ারে তুলেছে অমনি ব্যাঙ লাফিয়ে উঠল খাবার টেবিলে। বললে, "এবার তোমার থালাটা আমার কাছে ঠেলে দাও। আমরা একসঙ্গে খাব, কেমন?"

ইচ্ছে আর করে না! তবু থালাটা রাজকন্যা এগিয়ে দিল।

ব্যাঙ তো মহা আরামে খেতে লাগল; আর রাজকন্যা? তার গলায় খাবারগুলো যেন আটকে যেতে লাগল।

ব্যাঙ বললে, "আঃ! খেয়ে-দেয়ে ভারি খুশী হলাম। কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত। এবার আমাকে ওপরে নিয়ে চল তো। বিছানা করে দাও, আমরা একসঙ্গে তাতে ঘুমাবো।"

ব্যাঙের কথা শুনে রাজকন্যা তো কেঁদেই সারা! ঠাণ্ডা নোংরা একটা ব্যাঙ, তাকে শেষে ছুঁতে হবে! আবার সে কিনা সুন্দর ঝকঝকে তার বিছানায় শুতে চায়!

রাজকন্যার কান্না দেখে রাজা ভারি রেগে গেলেন। বললেন, "ছি, ছি, তোমায় যে সাহায্য করেছে তুমি এখন তাকে ঘেন্না করছ!"

রাজকন্যা তখন দুটো আঙুলে করে ব্যাঙকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখল ঘরের এক কোণে। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়।

যেই না রাজকন্যা শুয়েছে অমনি ব্যাঙ থপ্‌থপ্‌ করে খাটের কাছে গিয়ে বলল, "কই রাজকন্যা, আমায় তুলে নাও। আমার যে বড় ঘুম পেয়েছে। না তুললে আমি তোমার বাবাকে বলে দেবো।"

ব্যাঙের কথা শুনে রাজকন্যার সারা শরীর রাগে জ্বলে গেল।

সে ব্যাঙকে তুলে দেওয়ালে মারল এক আছাড়।



আর সঙ্গে সঙ্গে অবাক কাণ্ড! ব্যাঙ কোথায়? এ যে এক চমৎকার রাজপুত্তুর! সুন্দর টানা-টানা চোখ, টিকলো নাক, কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল!

রাজপুত্র বললে, "জানো রাজকন্যা, এক ডাইনী বুড়ী আমাকে ব্যাঙ করে দিয়েছিল। তুমি ছাড়া কেউ আমাকে ঝরনা থেকে তুলে আবার রাজপুত্তুর করতে পারত না। কাল তোমাকে নিয়ে আমি আমার রাজ্যে ফিরে যাব।"

তারপর আর কি? রাজা রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে দিলেন। রাজকন্যা মহা খুশী। কত বাজি পুড়ল, আলো জ্বলল, ধুমধাম হল। রাজ্যের লোক খেল পেট ভরে।

রাজপুত্র আর রাজকন্যার দিন কাটতে লাগল মহা সুখে।

# দর্জীর বাহাদুরি





॥ এক ॥

গরম কালের সকাল বেলা। এক দর্জী জানালার ধারে বসে জামা সেলাই করছিল। হঠাৎ শুনল এক চাষীর মেয়ে হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে—"ভাল আচার নেবে গো! ভাল ভাল আচার।"

দর্জীর আচার খেতে বড় ইচ্ছে করল। ডাকল, "কই গো বাছা, নিয়ে এস দেখি তোমার জিনিসপত্তর।"

চাষীর মেয়ে তার ঝুড়ি নিয়ে

এল। দর্জী ভাল দেখে খানিকটা আচার কিনল। তারপর খানিকটা পাউরুটি নিয়ে আচার মাখিয়ে রাখল। মনে মনে ভাবল, এই জামার সেলাইটা শেষ করে নিই। তারপর আচার দিয়ে পাউরুটি খেয়ে গায়ে জোর করা যাবে'খন।

আচার রেখে সে জামা সেলাই-এ মন দিল। আচারের ভুরভুরে গন্ধে ততক্ষণে ঘর ভরে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কোথা থেকে মাছি এসে বসছে পাউরুটির ওপর।

দর্জীর বড় রাগ হল। বললে, "তোমাদের আবার কে নেমন্তন্ন করেছে বাপু? যাও দিকি এবার।" কিন্তু মাছিরা তো আর তার ভাষা বোঝে না। তাদের নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না।

দর্জীর রাগ বেড়ে গেল। এক টুকরো কাপড় নিয়ে সে ঝপাং করে ছুঁড়ে মারল মাছিগুলোর ওপর। তারপর কাপড়টা তুলতেই দেখল সাত-সাতটা মাছি মরে রয়েছে ঠ্যাং ছড়িয়ে।

দর্জী নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে বললে, "শাবাশ! শাবাশ! এক ঘায়ে সাতটা খতম। সারা শহরে খবরটা তো জানান দরকার।"

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। একটা লাল কাপড়ের টুকরো দিয়ে সে লিখল, '**এক ঘায়ে সাতটা খতম**'। তারপর সেই লেখাটা নিজের জামায় সেলাই করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। বেরুবার আগে তার মনে হল, শুধু সারা শহরে কেন, সারা দুনিয়ার লোককে খবরটা জানাতে হবে। কত দূর যেতে হবে তার ঠিক নেই—দর্জী তাই যা পায় সঙ্গে নিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু সারা বাড়ি খুঁজে পেল মাত্র এক টুকরো মাখন আর একটা পাখী। দুটোই সে পুরে নিল জামার পকেটে।

দর্জী চলছে তো চলছেই। চলতে চলতে সে এসে পড়ল এক পাহাড়ের ওপর। পাহাড়ের ওপর দেখল একটা মস্ত বড় দৈত্য বসে রয়েছে মুখ গোমড়া করে! দর্জী ভয় পাবার পাত্র নয়। বুক ফুলিয়ে বললে, "নমস্কার ভায়া। তুমি এখানে বসে নীচের দুনিয়াটা দেখছ। আমিও ঐ দুনিয়াতে বেরিয়ে পড়েছি—বরাতটা যাচাই করে দেখতে। তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে?"

দৈত্য তার দিকে মুখ বেঁকিয়ে বললে, "কোথাকার একটা ভবঘুরে, হাভাতে!"

দর্জী বললে, "তা বলতে পার। তবে আমি কি ধরনের মানুষ জানতে চাও? এই দেখো—" বলেই সে জামাটা তুলে ধরল। দৈত্য পড়ল সেখানে লেখা রয়েছে—**'এক ঘায়ে সাতটা খতম'**। দৈত্য ভাবল, দর্জী বোধ হয় সাতটা মানুষ এক ঘায়ে সাবাড় করেছে। দর্জীর ওপর এবার একটু ভক্তি হল তার। তবু সে চায় দর্জীকে যাচাই করে দেখতে।

সে এক টুকরো পাথর নিয়ে এমন জোরে নিঙড়োলো যে পাথর থেকে জল পড়ল টপটপ করে। তারপর দর্জীকে বললে "তুমি তো খুব বাহাদুর, কর দেখি এই রকম!"

দর্জী বললে, "ও তো আমার কাছে ছেলেখেলা হে। ওর চেয়েও ভাল জিনিস দেখাচ্ছি, দেখো।" বলে সে পকেট থেকে মাখন বার করে নিঙড়োতেই মাখন পড়তে লাগল গলে গেল। দৈত্যের মুখে আর কথা নেই! এই ছোট্টখাট্ট মানুষ—তার গায়ে এত জোর!

দৈত্য তখন একটা প্রকাণ্ড পাথর নিয়ে আকাশে এত উঁচুতে

ছুঁড়ছিল। তাই আমি গাছের মাথা টপকে এদিকে এলাম। কই, তুমি লাফিয়ে গাছের মাথা টপকাও তো দেখি, কেমন পার ?"

দৈত্য দিল এক লাফ কিন্তু কিছুতেই গাছের মাথা টপকাতে পারল না। এবারেও তাই দর্জীরই জিত হল।

দৈত্য তখন বললে, "সত্যিই বাহাদুর তুমি। চল আজ রাতে আমাদের বাড়িতে থাকবে।" দর্জী রাজী হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা পাহাড়ের গুহায় দৈত্যের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দর্জী দেখল আরো দুটো দৈত্য রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে গোটা ভেড়ার মাংস। খাওয়া-দাওয়া সেরে দৈত্য দর্জীকে একটা বিছানা দেখিয়ে দিল। দৈত্যের বিছানা—মস্ত বড়। দর্জী তাতে শুতে পারবে কেন ? দর্জী তাই সুড়ুৎ করে এক ফাঁকে বিছানা থেকে নেমে ঘরের এক কোণে গিয়ে শুয়ে রইল।

মাঝরাতে দৈত্য ভাবল, দর্জী এতক্ষণে নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তখন লোহার প্রকাণ্ড একটা ডাণ্ডা নিয়ে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল এক ঘা। তারপর ভাবল, দর্জী মরে গেছে নিশ্চয়।

পরের দিন ভোর বেলায় দৈত্যরা বনে বেড়াতে গেছে। দর্জী ঘুম থেকে উঠে হাসতে হাসতে সেখানে গিয়ে হাজির। দৈত্যরা দর্জীকে দেখেই কাঁপতে লাগল ভয়ে। তারপর দে ছুট।

॥ দুই ॥

দর্জী চলেছে তো চলেছে—একেবারে নাকের সিধে। চলতে চলতে শেষে হাজির হল এক বিরাট রাজবাড়ির উঠোনে। শরীর বড় ক্লান্ত ; দর্জী তাই উঠোনের ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে

ছুঁড়ে দিল যে সেটা আর চোখেই দেখা গেল না। তারপর বললে —"কই, কর তো এই রকম!"

দর্জী বললে, "বাঃ ভালই ছুঁড়েছ। তবে কি জান, তোমার পাথরটা আবার মাটিতে এসে পড়বে। আমি এমন জোরে ছুঁড়বো যা আর মাটিতে পড়বেই না"—বলেই সে পাখীটা পকেট থেকে বার করে, ছুঁড়ে দিল ওপরে। ছাড়া পেয়ে পাখী সাঁ সাঁ করে ওপরে উঠে গেল—আর ফিরলো না।

দর্জী বললে, "কি! এবার দেখে খুশী হলে তো ভায়া?"

দৈত্য বললে, "হ্যাঁ, তোমার হাতে জোর আছে বটে। আচ্ছা চল আমার সঙ্গে।"

যেতে যেতে তারা এসে পড়ল এক বনের মধ্যে। এক মস্ত বড় চেরি গাছের ওপর পাকা পাকা ফল ধরে আছে। দৈত্য গাছের মগডাল ধরে টেনে নামিয়ে দর্জীর হাতে দিল। বললে, "নাও এটা ধরে ফলগুলো খাও।"

দর্জী ডালটা ধরল, কিন্তু তার গায়ে তো আর অত জোর নেই। যেই না দৈত্য ডালটা ছেড়ে দিল অমনি ডালটা ছিটকে উঠে গেল ওপরে। আর সেই সঙ্গে দর্জীও গাছের মাথা টপকে গিয়ে পড়ল অন্য দিকে।

দৈত্য বললে, "ব্যাপার কি হে, ডালটা ধরে রাখবার মত গায়ের জোর নেই নাকি তোমার?"

দর্জী বললে, "কি যে বল তার ঠিক নেই! যে এক ঘায়ে সাত সাতটা খতম করতে পারে, সে একটা ডাল আর ধরে রাখতে পারে না! আসলে কি হয়েছে জান? শিকারীরা ঐ ঝোপে তীর

নাক ডাকাতে লাগল। এমন সময় সেখানে এল কয়েকজন লোক। তাদের চোখে পড়ল সেই লেখা—'এক ঘায়ে সাতটা খতম'। তারা ভাবলে,—এ নিশ্চয় এক মহা বীরপুরুষ। কিন্তু এখানে এল কোথা থেকে? রাজাকে একবার খবর দিতে হয়। লড়াই-এর সময় এমন লোক দলে থাকলে আর ভাবনা কি? একে তো কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

রাজা পারিষদদের সঙ্গে পরামর্শ করে দর্জীর কাছে একজন দূত পাঠালেন। দূত যখন গেল, দর্জীর তখন সবে ঘুম ভেঙেছে। সে আড়মোড়া ভেঙে চাইছে মিটমিট করে। দূত বললে, "আপনি মহারাজের সেনাপতি হোন—এই অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন মহারাজ।"

দর্জী বললে, "সেই জন্যেই তো এসেছি এখানে। মহারাজের চাকরি করতে সব সময়ই আমি রাজী।"

তারপর খুব খাতির করে দর্জীকে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা দর্জীর থাকবার জন্য তৈরি করে দিলেন মস্ত একটা বাড়ি।

এদিকে হল কি, পারিষদরা দর্জীর হিংসেতে একেবারে ফেটে পড়তে লাগল। তারা ভাবলে, "ওর সঙ্গে লড়াই-এ গেলে তো ভারি বিপদ। ও তো এক এক ঘায়ে সাতটা করে খতম করবে। তখন আমরা আর মারব কাকে?"

পারিষদরা তখন গেল রাজার কাছে। বললে, "মহারাজ, আমরা চাকরি ছেড়ে দিলুম। এক ঘায়ে যে সাতটা করে খতম করে তার সঙ্গে আমরা কোন কাজই করব না।" রাজার ভারি দুঃখ হল। একজন লোকের জন্যে শেষে এতজন পুরনো লোককে

হারাতে হবে। দর্জীকে বিদায় দিতে পারলেই যেন তিনি বাঁচেন। কিন্তু তাকে তাড়াবার সাহস হল না। রাজার ভয় হল, দর্জীকে তাড়াতে গেলে সে হয়ত রাজাকেই মেরে ফেলবে আর নিজেই দখল করবে সিংহাসন।

শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে রাজা এক মতলব ঠাওরালেন। দর্জীকে ডেকে বললেন, "দেখো বাপু, আমার রাজ্যের উত্তরে আছে এক বন। সেখানে থাকে ছুটো দৈত্য। তারা ডাকাতি খুন-জখম করে আর আগুন লাগিয়ে প্রজাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কেউই নিজের প্রাণের মায়া ছেড়ে তাদের মারতে যেতে সাহস করে না। তুমি যদি তাদের মারতে পারো—তবে আমি তোমার সঙ্গে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবো; তোমায় যৌতুক হিসেবে দেবো অর্ধেক রাজ্য। তোমায় সাহায্য করার জন্য একশো জন সেরা বীরও তোমার সঙ্গে যাবে।"

দর্জী ভাবলে অর্ধেক রাজ্য আবার রাজকন্যা! এমন সুযোগ তো আর রোজ আসে না। বললে, "এ আর বেশি কথা কি মহারাজ! আমি একাই দৈত্য ছুটোকে ঠাণ্ডা করে দেবো; এর জন্যে আর একশো সেরা বীরের দরকার নেই। একবারে যে সাতটা খতম করতে পারে ছুটোকে তার আর ভয় কিসের!"

এই না বলে দর্জী বেরিয়ে পড়ল। তার পিছনে পিছনে চলল একশো বীর। বনের ধারে এসে দর্জী বললে, "তোমরা এখানেই থাকো। আমি একাই দৈত্য ছুটোকে সাবাড় করব।"

তারপর দর্জী এক দৌড়ে ঢুকল বনের মধ্যে, তাকাতে লাগল এদিক ওদিক। একটু এগিয়েই সে দেখল এক গাছের

নীচে দৈত্য দুটো ঘুমুচ্ছে। তাদের নাক ডাকার চোটে যেন ঝড় বইছে হুহু করে, গাছের ডালপালা কাঁপছে থর থর করে। দর্জী দু পকেটে অনেকগুলি পাথর ভরে নিয়ে উঠল গাছের ওপর। গাছের মাঝখানে উঠে একটা ডাল বেয়ে বেয়ে সে ঘুমন্ত দৈত্যদের ঠিক ওপরে এল। তারপর একটার পর একটা পাথর ফেলতে লাগল একটা দৈত্যের বুকে। খানিকক্ষণ দৈত্যের কোন সাড়া-শব্দ নেই। ওদিকে পাথর পড়েই চলেছে। একটু পরে দৈত্য চোখ মেলে পাশের দৈত্যকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই মারছিস কেন আমায় ?"

সে বললে, "আমি মারব কেন ? তুই নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছিস।"

তারপর আবার দুজনে ঘুমুতে লাগল।

দর্জী তখন একটা পাথর ফেলল অন্য দৈত্যটার বুকে।

দৈত্য চোখ মেলে পাশের দৈত্যকে বলল, "এর মানে কি শুনি ? আমায় ধাক্কা মারলি কেন ?"

"আমি তোর গায়ে হাতই দিই নি। তুই এবার স্বপ্ন দেখেছিস।"

দৈত্য রেগে বললে, "বটে! ইয়ারকি হচ্ছে ?" শুরু হল কথা কাটাকাটি আর তারপর দস্তুর মত মারামারি।

দুই দৈত্যই ক্ষেপে আগুন! প্রকাণ্ড দুটো গাছ তুলে নিয়ে এ মারল ওর মাথায়, ও মারল এর মাথায়। শেষ পর্যন্ত দুজনেই গেল মরে।

দর্জী তখন গাছ থেকে নেমে পড়ে তরোয়াল দিয়ে মরা দৈত্যদের বুকে বসিয়ে দিল এক কোপ। তারপর বনের বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কাছে গিয়ে বললে, "নাও হে, কাজ শেষ। দুটোকেই আমি খতম করেছি। সেকি সোজা কাজ! দৈত্য

ব্যাটারা গাছ উপড়ে নিয়ে খুব লড়াই করল। কিন্তু আমার সঙ্গে পারবে, সাধ্যি কি তাদের!"

রাজার লোকেরা বললে, "তোমার কিছু হয় নি?"

"আরে রামো! আমার গায়ে আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগে নি!"

রাজার লোকেরা প্রথমে বিশ্বাসই করল না। কিন্তু শেষকালে বনের মধ্যে গিয়ে দেখল দৈত্যদুটো মরে পড়ে রয়েছে, চারিদিকে রক্তের ছড়াছড়ি আর পাশে অনেক গাছপালা উপড়ে পড়ে আছে।

এবার দর্জী রাজার কাছে গিয়ে চাইল অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা। রাজা মনে মনে ভাবলেন, হায় হায় কেন মরতে ঐ প্রতিজ্ঞা করেছিলাম! কি করে দর্জীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় তাই ভাবতে বসলেন তিনি। শেষে বললেন, "দেখো বাপু, অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা পাবার আগে তোমায় আর একটা কাজ করতে হবে। বনের মধ্যে একটা এক-শিং-ওয়ালা বুনো ঘোড়া আছে। তার অত্যাচারে প্রজারা অস্থির। সেটাকে তোমায় ধরতে হবে।"

দর্জী বললে, "দু-দুটো দৈত্যকে সাবাড় করলাম আর এতো শুধু এক-শিং-ওয়ালা ঘোড়া!" বলেই সে একটা কুড়ুল আর খানিকটা দড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বনের দিকে। বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না; এক-শিং-ওয়ালা ঘোড়াটা বেরিয়ে এল কাছে। তারপর এমন ভাবে তেড়ে এল যেন দর্জীকে ফুঁড়েই ফেলবে। যেই না ঘোড়াটা একেবারে কাছে এলো অমনি দর্জী এক লাফে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘোড়াটা ভীষণ বেগে এসে ধাক্কা মারল গাছে। তার শিং

গাছের মধ্যে এমন গেঁথে গেল যে কিছুতেই আর সেটা বার করতে পারল না। এক-শিং-ওয়ালা ঘোড়া হল বন্দী।

দর্জী মনে মনে বললে, 'বাছাধন, এইবার তোমায় বাগে পেয়েছি।' গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে সে ঘোড়ার গলায় লাগাল দড়ির ফাঁস। কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেলল তার শিং। তারপর রাজার কাছে নিয়ে হাজির করল সেটাকে।

রাজা আর কি করেন! খুব ধুমধাম করে দর্জীর সঙ্গে বিয়ে হল রাজকন্যার। দর্জী হল অর্ধেক রাজ্যের রাজা।

বিয়ের কয়েক দিন পরের কথা। রাজকন্যা শুনল দর্জী ঘুমের ঘোরে বলছে, "ওহে ছোকরা, কোটটা ঠিক করে কাট, পাজামাটা ঠিক করে সেলাই কর—নইলে এই গজকাঠি দিয়ে তোমার মাথা ফাটাবো।" রাজকন্যার বুঝতে বাকী রইল না, তার স্বামী একজন দর্জী। রাজার কাছে গিয়ে সে কেঁদে পড়ল। দর্জীর সঙ্গে সে কিছুতেই ঘর করবে না।

রাজা বললেন, "আচ্ছা মা, এক কাজ করো। আজ রাতে তোমার ঘরের দরজা খোলা রেখো। দর্জী যখন ঘুমুবে, আমার লোকেরা গিয়ে তাকে বেঁধে একটা জাহাজে তুলে দেবে। জাহাজ তাকে নিয়ে চলে যাবে খুব দূর দেশে।"

কথাটা রাজকন্যার মনে ধরল। কিন্তু রাজার এক চাকর কথাটা শুনতে পেয়ে দর্জীর কাছে ফাঁস করে দিল। দর্জী বলল, "বটে। এত বড় সাহস! এই ব্যাপারের শেষ করব আমি।"

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দর্জী আর রাজকন্যা গিয়ে শুয়ে পড়ল। খানিক পরে রাজকন্যা ভাবল দর্জী ঘুমিয়ে পড়েছে। সে আস্তে আস্তে উঠে ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে আবার এসে শুলো বিছানায়।

দর্জী কিন্তু ঘুমোয় নি। ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল। রাজকন্যা শুতেই দর্জী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ওহে ছোকরা, কোটটা ঠিক করে বানাও, পাজামাটা ঠিক করে সেলাই কর—নইলে গজকাঠি দিয়ে তোমার মাথা ভাঙবো। এক ঘায়ে আমি সাত-সাতটা খতম করেছি, দু-দুটো দৈত্য মেরেছি, এক-শিং-ওয়ালা ঘোড়াকে বন্দী করেছি। যারা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ভয় করব আমি?"

ঘরের বাইরে থেকে রাজার চাকররা সেই কথা শুনেই ভয়ে কাঁপতে লাগল থর থর করে। তারপর যে যেদিকে পারল দৌড় মারল।

এর পর আর কেউ দর্জীকে ঘাঁটাতে সাহস করে নি। সে মনের সুখে বাকী জীবন রাজত্ব করতে লাগল!

———

# ভাই বোন



অনেক, অনেক কাল আগে এক বনে থাকত এক কাঠুরে। কাঠুরের ছিল একটি ছোট্ট ছেলে আর ছোট্ট একটি মেয়ে। ছেলের নাম হ্যানসেল, মেয়ের নাম গ্রেটেল। আর ছিল হ্যানসেন আর গ্রেটেলের এক সৎমা।

কাঠুরে ছিল বড় গরীব। কোন রকমে নিজেদের পেট চলে না।

এমন সময় একবার দেশে ছুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কাঠুরে মাথায় হাত দিয়ে বসল। এমনিতেই পেট চলে না,—এখন উপায় কি ?

একদিন রাতে কাঠুরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে আর ছটফট করছে। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বৌকে বললে, "কি যে করি কিছুই বুঝতে পারছি না। নিজেদেরই পেট চলে না —ছেলেমেয়েদের খাওয়াই কি ?"

বৌ বললে, "শোনো বলি। কাল সকাল বেলা ওদের বনের মধ্যে অনেক দূরে নিয়ে যাবো। সেখানে একটু আগুন জ্বেলে দেবো আর ছু'জনকে দেবো ছু'টুকরো রুটি। তারপর আমরা চলে যাবো কাঠ কাটতে, আর ফিরবো না। ওরা নিজেরা তো আর পথ চিনে ফিরতে পারবে না। ব্যস্, ওদের হাত থেকে আমরা রেহাই পেয়ে বাঁচব।"

কাঠুরে বললে, "না, না, না। সে আমি পারবো না। আমার ছেলেমেয়েদের একলা বনে রেখে আসার কথা তুমি বললে কি বলে ? বুনো জন্তরা এসে ওদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে না ?"

বৌ বললে, "ওরে মুখ্খু কোথাকার! তবে আমরা চার জনেই না খেয়ে মরি! যাও তুমি এবার কফিন যোগাড়ের ব্যবস্থা করো গে!"

কাঠুরের বৌ সারারাত ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল। শেষে বেচারী কাঠুরেকে রাজী হতে হল বৌএর কথায়। কিন্তু তার বড় মন কেমন করতে লাগল ছেলেমেয়ের জন্য।

হ্যানসেল আর গ্রেটেল কিন্তু ঘুমোয় নি। সৎমার সব

কথা শুনতে পেল তারা। গ্রেটেল তো কেঁদেই সারা ; বললে, "দাদা আমাদের কি হবে ?"

হ্যানসেল বললে, "কাঁদিস নে বোন, চুপ কর্। আমি একটা মতলব ঠিক করেছি।"

তারপর মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়লে হ্যানসেল চুপি চুপি দরজা খুলে গেল বাইরে।

বাইরে তখন চাঁদের আলোয় ফিনিক ফুটছে। দরজার সামনে সাদা পাথরের ওপর চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে রূপোর মত। হ্যানসেল যত পারল পাথর কুড়িয়ে জামার পকেটে পুরে নিল। তারপর ঘরে গিয়ে বোনকে বললে, "নে বোন এবার ঘুমো। ভগবান আমাদের বাঁচাবেন।" সে নিজেও শুয়ে পড়ল বিছানায়।

পরের দিন সকালে তখনও সূর্য ওঠে নি। সৎমা ছেলেমেয়েকে গিয়ে ডাক দিল, "এই কুঁড়ের বাদশারা! ওঠ্ এবার। আমরা যাচ্ছি বনে কাঠ কাটতে।" তারপর তাদের হাতে ছ'টুকরো রুটি দিয়ে বললে, "নে দুপুরবেলা খাবি। এখন খেয়ে ফেলিস নি যেন, তাহলে আর খেতে পাবি না।"

হ্যানসেলের পকেটে পাথর ঠাসা। গ্রেটেল তাই রুটি দুটো নিজের জামার পকেটে পুরে নিল।

পথে যেতে যেতে হ্যানসেল একবার করে দাঁড়ায় আর বাড়ির দিকে ফিরে ফিরে চায়! সে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল। কাঠুরে বললে, "কি রে, কি দেখছিস পেছন ফিরে? পিছিয়ে পড়ছিস কেন? সাবধানে চল্, হোঁচট খাবি শেষে।"

হ্যানসেল বললে, "বাবা, বেড়ালটা বাড়ির ছাদে বসে আছে। যাবার আগে সেটাকে দেখে নিচ্ছি একবার।"

সৎমা বললে, "আরে মুখ্খু, ওটা বেড়াল হবে কেন? ওটা তো রান্নাঘরের চিমনি। রোদ পড়ে অমন চকমক করছে।"

হ্যানসেল কিন্তু মোটেই বেড়াল দেখছিল না, মাঝে মাঝে থেমে সে চুপি চুপি পকেট থেকে একটা করে পাথর বনের পথের ওপর ফেলে দিচ্ছিল।

বনের মাঝখানে এসে কাঠুরে বললে, "যা দিকি কিছু কাঠকুটো নিয়ে আয়। আগুন জ্বালিয়ে দিই। তাহলে আর তোদের শীত করবে না।" ভাই-বোনে গিয়ে একরাশ কাঠকুটো কুড়িয়ে আনল।

তারপর আগুন জ্বালিয়ে সৎমা বললে, "নে তোরা এই আগুনের ধারে বসে জিরো। আমরা কাঠ কাটতে যাচ্ছি। কাজ সারা হলে ফেরার সময় তোদের ডেকে নিয়ে যাবো।"

ভাই-বোন আগুনের ধারে বসে রইল চুপটি করে। দুপুর হল। ক্ষিধে পেয়েছে খুব। দু'জনে তখন খেল একটা করে রুটি। বসে বসে ক্লান্তিতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। কখন যে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়ালই ছিল না।

ঘুম যখন ভাঙল, রাত হয়ে গেছে। চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। গ্রেটেল কাঁদতে কাঁদতে বললে, "দাদা, আমরা এখন বন থেকে বেরুব কি করে?"

হ্যানসেল বললে, "একটু সবুর কর্। চাঁদ উঠুক আগে। তখন চাঁদের আলোয় আমরা ঠিক পথে খুঁজে নেব।"

চাঁদ উঠতেই হ্যানসেল বোনের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল।

চাঁদের আলোয় পাথরগুলো রূপোর মত জ্বলছে। সেই পাথর দেখে দেখে তারা চলতে লাগল। সারা রাত ধরে তারা হাঁটছে তো হাঁটছে। শেষে সকালবেলা ভাই-বোন গিয়ে পৌঁছল বাড়িতে।

দরজার কড়া নাড়তেই সৎমা বেরিয়ে এল। আর তাদের দেখেই রাগে জ্বলে উঠল। বললে, "হতভাগ্য, বদমাইশ! বনের মধ্যে এতক্ষণ ঘুমুনো হচ্ছিল, বুঝি! আমরা তো ভাবলুম, তোরা বুঝি আর বাড়িতে ঢুকবিই না।"

কাঠুরে কিন্তু ছেলেমেয়েদেরকে দেখে খুব খুশী। বনের মধ্যে ওদের ছেড়ে এসে দুঃখে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

কিছুদিন পরে আবার দেশে দুর্ভিক্ষ হল। একদিন রাত্রে ভাই-বোন শুনল সৎমা বাবাকে বলছে, "ঘরে যা ছিল সব শেষ। শুধু আধখানা পাউরুটি আছে। ছেলেমেয়েদের আবার রেখে আসতে হবে। এবার আরো গভীর বনের মধ্যে তাদের ছেড়ে আসব। এ ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।"

কাঠুরে বললে, "তার চেয়ে যা আছে তাই সকলে ভাগ করে খাওয়া ভাল।"

বৌ সে কথা শুনতে নারাজ। শেষে কাঠুরে বেচারীকে আবার রাজী হতে হল বৌ-এর কথায়।

ভাই-বোন জেগে জেগে সব শুনল। মা ঘুমুতেই হ্যানসেল উঠে পড়ল পাথর কুড়োবার জন্য। কিন্তু এবার সৎমা আগেই দরজায় চাবি দিয়ে রেখেছিল। ফলে হ্যানসেল বেরুতে পারল না।

তবু সে বোনকে বললে, "ভয় নেই বোন। ভগবান আমাদের বাঁচাবেন।"

পরের দিন সকালে সৎমা তাদের টেনে তুলে দু'জনের হাতে দু'টুকরো রুটি দিল। তারপর নিয়ে চলল বনে।

পথে যেতে যেতে হ্যানসেল একবার করে দাঁড়ায় আর রুটির টুকরো পথের ওপর ছড়িয়ে দেয়।

শেষে গভীর বনের মধ্যে তারা এল। এ বনে তারা আর কখনো আসে নি। কাঠুরে-বৌ বললে, "এইখানে আগুন জ্বেলে দিলুম; বসে জিরো। ঘুম পেলে একটু ঘুমিয়ে নিস। সন্ধ্যের সময় কাজ সারা হলে আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব।"

দুপুরবেলায় গ্রেটেল তার রুটি হ্যানসেলের সঙ্গে ভাগ করে খেল। হ্যানসেলের রুটি তো সে পথে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই তার কাছে আর রুটি ছিল না।

তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যা নেমে এল। তাদের ঘুম ভাঙল। রাত গাঢ় হল। তবু কেউ নিতে এল না।

হ্যানসেল বললে, "ভয় কি বোন! চাঁদ উঠুক। চাঁদের আলোয় রুটির টুকরোগুলো দেখে আমরা পথ খুঁজে নেবো।"

একটু পরে চাঁদ উঠল। কিন্তু রুটির টুকরো আর দেখা গেল না। বনের হাজার রকমের পাখী আগেই তা খেয়ে ফেলেছিল। তবু হ্যানসেল বোনকে সান্ত্বনা দেয়—"দেখ্ না, এইবার ঠিক পথ খুঁজে পাবো।"

কিন্তু পথ আর খুঁজে পেল না। সারা রাত ধরে চলেছে তো চলেছেই। পরের দিনও গেল। তবু বনের বাইরে তারা যেতে পারল

না। সারা রাত সারাদিন শুধু বনের ফল ছাড়া আর কিছু খাবার জোটে নি। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। পা আর চলে না। শেষে এক গাছের তলায় এসে ভাই-বোন ঘুমিয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে তিন দিন তিন রাত কেটে গেল। তবু চলার শেষ নেই। যতই চলেছে আরো গভীর বনের মধ্যে গিয়ে পড়ছে তারা। হ্যানসেল বুঝল, শীগ্‌গির বন থেকে বেরুতে না পারলে তাদের না খেয়ে মরতে হবে। দুপুরবেলা হঠাৎ তারা দেখলে দুধের মত সাদা একটা পাখী গাছের ডালে বসে গান গাইছে। কি মিষ্টি গান! ভাই-বোন দাঁড়িয়ে পাখীটাকে দেখতে লাগল। একটু পরেই পাখীটা উড়তে শুরু করল। হ্যানসেল আর গ্রেটেলও চলল পাখীর পিছু পিছু। উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে পাখীটা গিয়ে শেষে বসল একটা কুঁড়েঘরের চালে। কুঁড়েঘরটার কাছে এসে ভাই বোন তো অবাক! কুঁড়েঘরটা রুটি আর কেক দিয়ে তৈরী আর জানালার শার্সিগুলো তৈরী পরিষ্কার চিনি দিয়ে।

হ্যানসেল বললে, "আঃ কি মজা! চল্ আমরা বাড়িটায় যাই। এবার পেট ভরে খাওয়া যাবে। আমি খাব বাড়ির ছাদ আর তুই খাবি জানালাগুলো।"

হ্যানসেল এগিয়ে গিয়ে ছাদের একটা টুকরো ভেঙে চাখতে লাগল। আর গ্রেটেল দিল জানলার ওপর এক কামড় বসিয়ে।

হঠাৎ তারা শুনল ঘরের মধ্যে থেকে কে যেন খন খনে স্বরে বলছে, "কে রে ঠুক্‌ঠুক্ ঠুকঠুক্ করে আমার দরজা নাড়ায়?"

ওরা বললে, "ও কিছু নয়, হাওয়া।" বলে আবার খেয়ে চলল মনের আনন্দে!

ছাদের টুকরোটা হ্যানসেলের ভারি ভাল লাগছিল। সে তাই আরো খানিকটা ভেঙে নিল। জানালার শার্সিগুলোও ভারি মিষ্টি। গ্রেটেলও আর খানিকটা নিল ভেঙে। তারপর সেখানে বসেই দিব্যি আরাম করে তারা খেতে লাগল।

এমন সময় কুঁড়েঘরের দরজা গেল খুলে। আর এক থুথ্‌থুড়ে বুড়ী লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে এল গুড়ি গুড়ি। বুড়ীকে দেখে তো ভাই-বোন ভয়ে কাঠ! তাদের হাতের খাবার গেল পড়ে।

বুড়ী বললে, "কে বাছা তোমরা। ভয় পেয়ো না। এসো আমার ঘরে। এখানে আমার কাছে তোমরা থাকবে, কেমন?" তারপর তাদের হাত ধরে বুড়ী নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

ঘরে গিয়ে বুড়ী দুধ, কেক, আপেল, বাদাম, কত কি যে তাদের খেতে দিল তার ইয়ত্তা নেই। খাওয়া হলে পাশের ঘরে গিয়ে চমৎকার বিছানায় তারা শুয়ে পড়ল।

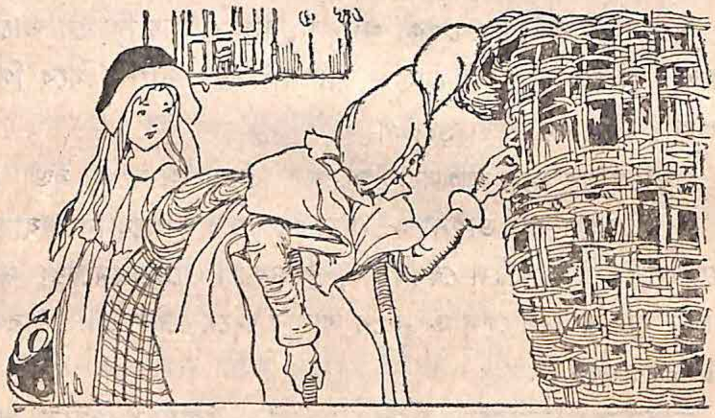
বুড়ীকে খুব ভাল লাগল দু'জনের। কিন্তু আসলে বুড়ী কে জান? সে হল এক ডাইনী। ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে তৈরি করেছিল কেকের ঐ কুঁড়েঘর। ছেলেমেয়েরা তার হাতের মুঠোয় এসে গেল তখন সে তাদের মেরে ফেলত। তারপর রান্না করে খেত।

ডাইনীদের চোখ লাল টক্‌টকে। তারা বেশিদূর দেখতে পায় না। কিন্তু দূর থেকেই তারা মানুষের গন্ধ পায়। হ্যানসেল আর গ্রেটেল যখন কুঁড়ের কাছে এল, বুড়ী ডাইনী গন্ধ পেয়ে বুঝতে পারল। সে মনে মনে ভাবলে, "এবার আর এদের ছাড়ছি না।"

সকাল হতেই ডাইনী পাশের ঘরে গেল। দেখল, ভাই-বোন

ঘুমুচ্ছে। লাল টুক্‌টুকে তাদের গাল। বললে, "আঃ এদের এক কামড় খাসা লাগবে।"

সে তখন হ্যানসেলকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে রাখল একটা খাঁচায় পুরে। হ্যানসেল হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগল কিন্তু চেঁচালে কি হবে—ডাইনীর হাত থেকে সে ছাড়া পেল না। তারপর গ্রেটেলকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলে বললে, "ওঠ্, ওঠ্, কুঁড়ের বাদশা। যা ভাই-এর জন্যে ভাল খাবার রাঁধ। ওকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা-সোটা করতে হবে। মোটা-সোটা হলে তখন ওকে আমি খাবো আরাম করে।"



ডাইনীর কথা শুনে গ্রেটেল খু-উ-ব কাঁদতে লাগল। তবু ডাইনীর হুকুম মতই চলতে হল তাকে। হ্যানসেলের জন্যে খুব ভাল খাবার রান্না হল। আর গ্রেটেলকে বুড়ী খেতে দিল শুধু কাঁকড়ার দাড়া।

রোজ সকালে ডাইনী বুড়ী খাঁচার কাছে এসে ডাকে, "হ্যানসেল, আঙুলটা বাড়া তো, দেখি কতটা মোটা হলি।"

হ্যানসেল, আঙুলের বদলে বাড়িয়ে দেয় একটা হাড়ের টুকরো। বুড়ী চোখে খুব কম দেখে। সে ভাবে ওটাই বুঝি আঙুল; আর অবাক হয়ে ভাবে, হ্যানসেল তো কই মোটা হচ্ছে না!

চার হপ্তা কেটে গেল। হ্যানসেল তবু মোটা হয় না দেখে ডাইনী বুড়ী গেল ক্ষেপে। আর তার তর সইছে না।

একদিন গ্রেটেলকে ডেকে বললে, "এই মেয়েটা, উনুনে জল চাপা। হ্যানসেল মোটাই হোক আর রোগাই হোক, আজ ওকে রেঁধে খাবই খাব।"

বেচারী গ্রেটেল তো ভয়েই সারা। ডাইনী তবু তাকে দিয়েই জল আনালে। তার চোখের জলে বুক ভেসে গেল। কাঁদতে কাঁদতে বললে, "হা ভগবান, কে আমাদের বাঁচাবে! এর চেয়ে যে বনের জন্তুদের পেটে গেলে ছিল ভাল। তখন তো দু'জনে একসঙ্গে মরতে পারতুম।"

ডাইনী বললে, "চুপ কর্। আর প্যান প্যান করে কাঁদতে হবে না। উনুন ধরা।"

উনুন ধরল দাউ দাউ করে। ডাইনী বললে, "প্রথমে আমরা রুটি সেঁকবো।" বলে সে গ্রেটেলকে উনুনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, "দেখ্ দিকি, ভাল ধরেছে কিনা—তাহলে রুটিটা উনুনে দিবি।"

আসলে ডাইনী বুড়ীর মতলব ছিল, গ্রেটেলকে উনুনে সেঁকে খাবে। গ্রেটেল তা বুঝতে পেরে বললে, "আমি তো রুটি সেঁকতে জানি না!"

"আ মরণ! তাও জানিস না। এই দেখ্ কিভাবে করে"—বলে বুড়ী যেই-না গেছে উনুনের ধারে, গ্রেটেল তাকে চেপে ধরল উনুনের মধ্যে। বুড়ীর তখন সে কি চিৎকার! চ্যাচাতে চ্যাচাতে সে মরেই গেল।

গ্রেটেল তখন ছুটতে ছুটতে গেল হ্যানসেলের কাছে। খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে বললে, "হ্যানসেল, হ্যানসেল, আমরা বেঁচে গেছি। বুড়ী ডাইনীটা মরে গেছে!"

শুনেই হ্যানসেল এক লাফে বেরিয়ে এল খাঁচা থেকে। ভাই-বোনের তখন সে কি আনন্দ! এখন আর ভয় পাবার কিছু নেই। বুড়ীর ঘরের কোণে ছিল ঝুড়ি ভরতি হীরে-চুনি-পান্না।

হ্যানসেল বললে, "পাথরের চেয়ে এগুলো অনেক ভাল।" দু'জনে তখন যত পারল হীরে-পান্না ভরে নিল পকেটে মুঠো মুঠো করে।

হ্যানসেল বললে. "এবার এই ভূতুড়ে বন থেকে পালাতে হবে, চল্ চল্।"

ঘণ্টা দুই চলার পর তারা এল এক মস্ত বড় নদীর ধারে। হ্যানসেল বললে, "এইবার তো মুশ্‌কিল! নদীতে কোন সাঁকো দেখি না। পার হই কি করে?"

গ্রেটেল বললে, "কোন নৌকোও তো দেখছি না। শুধু একটা হাঁস জলে চরছে। দেখি হাঁসকে বলে, ও নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবে।"

বলেই সে গান ধরল,

"হংস ভায়া, হংস ভায়া,
পার করে দাও নদীর জল।
নাও নেই, সাঁকো নেই,
জল যে করে টলমল।"

হাঁস তখন এল তাদের কাছে। হ্যানসেল হাঁসের পিঠে বসে বোনকে বললে পাশে বসতে। গ্রেটেল বললে, "না, ত্ব'জনে হাঁসের পিঠে চাপলে ওর কষ্ট হবে। তার চেয়ে ও এক এক করে আমাদের পার করে দেবে।"

হাঁসও তাই করল। নদী পার হয়ে তারা দেখল এ বন তাদের চেনা। যতই যায়, ততই চোখে পড়ে চেনা পথ। তারপর ছুটতে ছুটতে তারা গিয়ে হাজির হল একেবারে বাড়ির মধ্যে। বাপকে দেখেই জড়িয়ে ধরল গলা।

ছেলেমেয়েকে বনে রেখে আসার পর থেকে বেচারী কাঠুরের চোখে এক ফোঁটা ঘুম ছিল না। ওদের সৎমা মরে গিছল আগেই।

গ্রেটেল তার জামা খুলতেই ঝর ঝর করে পকেট থেকে পড়ল হীরে-চুনি-পান্না। হ্যানসেলও পকেট থেকে মুঠো মুঠো করে সব বার করল।

কাঠুরের ত্বঃখকষ্ট আর রইল না। মনের সুখে তখন দিন কাটতে লাগল তাদের।

———

# স্নোহোয়াইট আর সাত বামন





এক ছিল রাণী। রাণীর বড় দুঃখ, তাঁর কোন ছেলেমেয়ে নেই। শীতকালের এক সকাল বেলা। বাইরে দুধের মত সাদা বরফ পড়ছে। কালো কুচ্‌কুচে এক জানালার ধারে বসে রাণী রাজার শার্ট সেলাই করছেন। সেলাই করতে করতে রাণীর হাতে ছুঁচটা হঠাৎ ফুটে গেল। ফুটতেই টপ্‌ টপ করে তিন ফোঁটা লাল রক্ত পড়ল বরফের ওপর। রাণী ভাবলেন, আহা, আমার যদি একটা মেয়ে থাকত—এই বরফের মত সাদা, এই রক্তের মত লাল, আর এই জানালার মত কালো কুচ্‌কুচে !'

কিছুদিন বাদেই রাণীর এক মেয়ে হল। সে মেয়ে বরফের মত ফরসা, রক্তের মত টুকটুকে তার গাল, কুচ্‌-কুচে কালো তার কেশ। রাণী তার

নাম দিলেন স্নো-হোয়াইট। স্নো-হোয়াইট জন্মাবার কিছুদিন পরেই মারা গেলেন রাণীমা।

দিন গেল, মাস গেল, বছর ঘুরে এল। রাজা তখন আবার বিয়ে করলেন। নতুন রাণী খু-উ-ব সুন্দরী; কিন্তু ভারী দেমাক তার। তার চেয়ে কেউ সুন্দরী থাকবে এ তার একদম সহ্য হত না।

রাণীর ছিল একটা মায়া-আয়না। রাণী সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলত ঃ

"আয়না, আমার আয়না,
সবার সেরা রূপবতী, নামটি তার কওনা।"

আয়না বলত ঃ

"তুমিই রাণী রূপবতী, তুলনা তার হয় না।"

রাণী জানত আয়না কখনো মিথ্যে বলে না। তার তাই খুশি আর ধরে না।

এদিকে ছোট্ট স্নো-হোয়াইট যত বড় হতে লাগল ততই তার রূপ ফেটে পড়তে লাগল। তার রূপের আলোয় যেন দিনের আলো ঢাকা পড়ে যায়! রাণীর চেয়েও সে হয়ে উঠলে সুন্দরী।

একদিন রাণী আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল ঃ

"আয়না আমার আয়না,
সবার সেরা রূপবতী, নামটি তার কওনা।"

আয়না বললেঃ

"তুমিই রাণী রূপবতী ছিলে আমি জানি,
এখন সেরা রূপবতী রাজকন্যা মানি।"

আয়নার কথা শুনেই হিংসেতে রাণীর সারা শরীর জ্বলে গেল। এখন স্নো-হোয়াইটকে দেখলেই রাণীর রাগ হয়।

যত দিন যায় রাণীর হিংসে বাড়ে; দিনে তার স্বস্তি নেই, রাতে ঘুম নেই। শেষে একদিন এক শিকারীকে ডেকে রাণা বললে, "এই মেয়েটাকে বনের মধ্যে নিয়ে যাও। আমি আর ওর মুখ দেখতে চাই না। তুমি ওকে মেরে ফেলবে। তারপর ওর জিভ আর হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে আসবে আমার কাছে।"

শিকারী রাণীর কথা শুনে স্নো-হোয়াইটকে নিয়ে বনে চলে গেল। তারপর যেই-না শিকারী ওকে মারবে বলে ছুরিটা বার করেছে, স্নো-হোয়াইট অমনি কেঁদে উঠে বললে, "ওগো আমায় মেরো না, আমায় মেরো না। আমি বনের মধ্যে অনেক দূরে পালিয়ে যাবো, আর কখনো বাড়িতে ফিরবো না। দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও।"

ছোট্ট মেয়ের কান্না শুনে শিকারীর প্রাণে দয়া হল। স্নো-হোয়াইটকে ছেড়ে দিয়ে সে বললে, "তবে পালাও শীগ্‌গির।" মনে মনে সে ভাবলে, "শীগ্‌গিরই তুমি যাবে বুনো জন্তু-জানোয়ারের পেটে।" যাই হোক, নিজের হাতে স্নো-হোয়াইটকে মারতে হয়নি ভেবে তার বুক অনেকটা হালকা হয়ে গেল।

একটু পরেই বনের মধ্যে দেখা গেল একটা বুনো শুয়োর। শিকারী তাড়া করল তার পিছনে। শেষকালে সেটাকে মেরে তার হৃৎপিণ্ড আর জিভটা রাণীর কাছে নিয়ে হাজির করল।

এদিকে স্নো-হোয়াইট একা। চারিদিকে এত গাছপালা দেখে তার ভয় করতে লাগল। কোন্‌দিকে যাবে কিছুই বুঝতে

পারল না। শেষে সে ছুটতে লাগল ; ছুট-ছুট-ছুট। পাথরের ওপর দিয়ে, কাঁটা গাছের ওপর দিয়ে ছুটে চলল। বুনো জন্তুরা তাকে দেখে গর্জন করতে লাগল—কিন্তু তার কোন ক্ষতি করল না। ছুটতে ছুটতে পা আর চলে না। আঁধার হয়ে এল। শেষে কাছে একটা কুঁড়েঘর দেখে সে গিয়ে ঢুকল তার মধ্যে।

এই কুঁড়ের মধ্যে সবকিছু ঝক্‌ঝক্, তক্‌তক্ করছে। ভারি চমৎকার। কিন্তু সব জিনিসই খুব ছোট ছোট। ঘরের মধ্যিখানে একটা ছোট টেবিল, তাতে সাদা ধবধবে কাপড় পাতা। কাপড়ের ওপর সাতটা ছোট ছোট থালা ; প্রত্যেক থালার ওপর একটা ছোট কাঁটা চামচে আর ছুরি ; পাশে সাতটা ছোট ছোট মগ। দেওয়ালের পাশে পর পর সাতটা ছোট ছোট বিছানা সাজানো। স্নো-হোয়াইটের ক্ষিদে-তেষ্টায় প্রাণ যাচ্ছে। সে প্রত্যেক থালা থেকে একটু একটু খাবার তুলে খেল, প্রত্যেক মগ থেকে একটু করে জল খেল।

স্নো-হোয়াইটের ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল। বড় ক্লান্ত সে। সে প্রথমে গিয়ে শুলো একটা বিছানায়। না, এটায় ঠিক জুত হচ্ছে না। দ্বিতীয়টা বড্ড বড়, ৪নং টা বড্ড ছোট, আর একটা—বড় শক্ত। শেষে ৭নং বিছানাটা তার পছন্দ হল। সেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

রাত যখন গভীর তখন কুটীরের মালিকেরা এল ফিরে। এই কুটীরে থাকত সাতটা বামন ; তারা পাহাড় কেটে নানা জিনিস যোগাড় করত।

ঘরে ঢুকে তারা সাতটা বাতি জ্বালাল। সারা ঘর আলো হয়ে

উঠল সেই বাতির আলোয়। আর অমনি বামনরা বুঝতে পারল কেউ নিশ্চয় ঢুকেছে তাদের ঘরে। জিনিসপত্র তারা যেমনটি রেখে গিয়েছিল তেমনটি তো নেই।

প্রথম বামন বললে, "আমার চেয়ারে কে বসেছে?"

দ্বিতীয় বামন বললে, "আমার থালায় কে খাবার খেয়েছে?"

তৃতীয় বামন বলল, "আমার রুটিতে কে হাত দিয়েছে?"

চতুর্থ জন বললে, "আমার মাংস খেল কে?"

পঞ্চমটি বললে, "আমার কাঁটা চামচে কে নাড়ানাড়ি করেছে?"

ষষ্ঠটি বললে, "আমার ছুরি দিয়ে কে জিনিস-পত্তর কেটেছে?"

সপ্তম বামন বললে, "আমার মগে কে জল খেয়েছে?"

প্রথম বামন তখন চারদিকে তাকিয়ে বলল, "আমার বিছানায় কে শুয়েছিল?" তার কথা শুনে আর সকলে তাকাল নিজেদের বিছানার দিকে। সবকিছু নাটঘাঁট হয়ে গেছে। শেষে সকলে একসঙ্গে বললে "নিশ্চয় কেউ আমাদের বিছানায় শুয়েছে।"

সপ্তম বামন তখন নিজের বিছানায় গিয়ে দেখে সেখানে স্নো-হোয়াইট অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সে সকলকে ডেকে আনল। সকলে আলোগুলো তুলে ধরল; আলো গিয়ে পড়ল স্নো-হোয়াইটের মুখের ওপর।

সকলেই অবাক হয়ে বলল, "ওমা, কি সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে!" তাদের ভারি আনন্দ হল। তারা আর জাগালো না স্নো-হোয়াইটকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। সাত নং বামনের বিছানায় শুয়েছিল স্নো-হোয়াইট। সে তাই অন্যদের বিছানায় শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিল।

সকাল হতেই স্নো-হোয়াইটের ঘুম ভাঙলো। সাতজন বামনকে দেখে তো ভয়েই সারা। কিন্তু বামনরা ভারি ভাল। তারা জিগ্যেস করল, "তোমার নাম কি বাছা ?"

স্নো-হোয়াইট বললে, "আমার নাম স্নো-হোয়াইট।"

"আমাদের বাড়িতে কেন ঢুকেছ তুমি ?"

তখন স্নো-হোয়াইট নিজের সব কথা বললে। কেমন করে তার সৎমা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কেমন করে শিকারী দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে, কেমন করে সে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছে—সেই সব কথা।

তার কথা শেষ হতে বামনরা বললে, "তুমি আমাদের ঘরকন্না দেখাশুনো করবে ? রান্না করা, বিছানা করা, ধোয়া-মোছা, জামা সেলাই করা, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা—এই সব আর কি ! এসব যদি তুমি কর, আমরা তোমায় এখানে থাকতে দেবো। তোমার কোন অভাবই থাকবে না।"

স্নো-হোয়াইট বললে, "নিশ্চয়ই। আমার সাধ্যমত সব করব।" স্নো-হোয়াইট তাই সেখানেই রয়ে গেল।

সকাল বেলা বামনরা পাহাড়ে যায় সোনা দানা আনতে। রাতে ফিরে এসে দেখে, তাদের খাবার তৈরী হয়ে আছে।

দিনের বেলায় মেয়েটা বাড়িতে একলা থাকে। তাই বামনরা একদিন বললে, "খুব সাবধানে থেকো স্নো-হোয়াইট। তোমার সৎমা শীগ্‌গির জানতে পারবে তুমি এখানে আছো। কাউকে যেন বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিও না।"

এদিকে হয়েছে কি, রাণী ভেবেছে সে স্নো-হোয়াইটের জিভ

আর হৃৎপিণ্ড দিয়ে তরকারি খেয়েছে। দুনিয়ায় এখন আর তার মত সুন্দরী কেউ নেই। একদিন রাণী তার আয়নার সামনে গিয়ে বললে ঃ

"আয়না, আমার আয়না,
সবার সেরা রূপবতী নামটি তার কওনা।"

আয়না জবাব দিলে ঃ

"তুমিই রাণী রূপবতী ছিলে আমি জানি,
এখন সেরা রূপবতী রাজকন্যা মানি।
পাহাড় ঘেরা গভীর বনে
রেখেছে তায় সাত বামনে॥"

শুনে রাণীর শরীর রাগে রিরি করতে লাগল। আয়না সত্যি কথা ছাড়া বলে না। শিকারীটা ঠকিয়েছে তাকে। স্নো-হোয়াইট এখনো তাহলে বেঁচেই আছে। কি করে স্নো-হোয়াইটকে মারা যায় এই শুধু এখন রাণীর ভাবনা।

শেষে রাণীর মাথায় এক মতলব এল। মুখে চোখে রং মেখে, জামা-কাপড় বদলে সে সাজল এক ফিরিওয়ালী। এখন আর তাকে রাণী বলে চেনার জো নেই। ফিরিওয়ালী সেজে সাত নদী সাত পাহাড় পেরিয়ে রাণী এসে পৌঁছল সাত বামনের বাড়ি। তারপর দরজার কড়া নেড়ে হাঁকল, "ভাল জিনিস নেবে গো, ভাল ভাল জিনিস?"

স্নো-হোয়াইট জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বললে, "কি জিনিস আছে গো বাছা?"

রাণী বললে, "ভাল জিনিস, খুব চমৎকার জিনিস। নানা রঙের

পোশাক।”—এই-না বলে সে তুলে ধরল ঝক্‌ঝকে একজোড়া পোশাক।

স্নো-হোয়াইট ভাবলে, একে দোর খুলে দিলে আর কি হয়েছে! সে দরজা খুলে দিয়ে একজোড়া পোশাকের দর করলে।

বুড়ী-বেশী রাণী বললে, “এ পোশাকে তোমায় চমৎকার মানাবে। এসো, আমি পরিয়ে দিই।”

তারপর এমন এঁটে পোশাক পরিয়ে দিল যে স্নো-হোয়াইটের দম বন্ধ হয়ে এল। সে মড়ার মত পড়ে গেল ধপাস করে।

রাণী ভাবলে, ব্যস্‌, এইবার আর আমার মত সুন্দরী কেউ রইল না! তারপর সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে সাত বামন বাড়ি ফিরে এল। ঘরের মধ্যে স্নো-হোয়াইটকে মড়ার মত পড়ে থাকতে দেখে তারা তো ভয়েই সারা। তারা তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরল। বুঝল, খুব আঁট করে পোশাক পরেই যত বিপদ হয়েছে। তাড়াতাড়ি তারা পোশাকের ফাঁসগুলো কেটে দিতেই আবার স্নো-হোয়াইটের শ্বাস বইতে লাগল। একটু পরে আস্তে আস্তে উঠে বসে সে সব কথা বলল বামনদের।

বামনরা সব শুনে বললে, “ঐ বুড়ী তোমার সৎমা ছাড়া কেউ নয়। খুব সাবধানে থেকো। আর যেন কাউকে দোর খুলো না।”

ইতিমধ্যে রাণী বাড়ি ফিরে গেছে। গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বললে:

“আয়না, আমার আয়না,
সবার সেরা রূপবতী নামটি তার কওনা।”

আয়না আগের মতই জবাব দিলে ঃ

"তুমিই রাণী রূপবতী ছিলে আমি জানি,
এখন সেরা রূপবতী রাজকন্যা মানি।
পাহাড় ঘেরা গভীর বনে
রেখেছে তায় সাত বামনে।"

যেই-না আয়নার কথা শেষ হয়েছে, অমনি রাণীর বুক দপ্ দপ্ করে উঠল। হিংসেয় কাঁপতে কাঁপতে রাণী ভাবলে, "এমন ব্যবস্থা করব এবার যাতে স্নো-হোয়াইট মরবেই মরবে।"

রাণী নানা রকম তুক-তাক জানত। তাই দিয়ে সে একটা বিষ-মাখানো চিরুনি তৈরি করল। তারপর জামাকাপড় বদলে, বুড়ী থুড়থুড়ী সেজে, সাত নদী সাত পাহাড় পেরিয়ে গেল সাত বামনের বাড়ি। দরজার কড়া নেড়ে ডাকল, "আজ ভাল ভাল জিনিস আছে গো।"

স্নো-হোয়াইট উঁকি মেরে বললে, "আজ যাও বাছা, আমার দরজা খুলতে ভয় লাগছে।"

বুড়ী তার বিষ-মাখানো চিরুনিটা তুলে ধরে বললে, "আজ কি এনেছি একবার দেখোই না এতো ভয় কিসের!"

চিরুনিটা দেখে স্নো-হোয়াইটের এত ভাল লাগল যে সে দোর খুলে দিল।

চিরুনি কেনা হতেই বুড়ী বললে, "এসো আমি তোমার মাথা ভাল করে আঁচড়ে দিই।"

রাজকন্যা রাজী হল ওর কথায়।

যেই-না বুড়ী চিরুনি মাথায় ছুঁইয়েছে অমনি রাজকন্যা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

রাণী বললে, "ওগো সুন্দরী, এবার তোমার সব শেষ।" বলে সে চলে গেল সেখান থেকে।

ক্রমে রাত হল ; সাত বামন ফিরে এল। স্নো-হোয়াইটকে পড়ে থাকতে দেখে তারা বুঝতে পারল এ সেই হিংসুটে রাণীরই কাজ। তারপর বিষের চিরুনিটা দেখে স্নো-হোয়াইটের মাথা থেকে সেটা টেনে বার করল। অমনি স্নো-হোয়াইট উঠে বসে বলল সব কথা। বামনরা তখন আবার তাকে সাবধান করে দিল যেন দোর সে না খোলে।

ইতিমধ্যে রাণী বাড়ি ফিরে আয়নাকে আগের মতই প্রশ্ন করল। জবাবও পেল আগের মতই।

রাগে আর হিংসেয় রাণীর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। রাণী শপথ করল, স্নো-হোয়াইটকে মারবেই মারবে, তাতে তার নিজের প্রাণ যায় সেও ভাল। তারপর রাণী ঢুকল নিজের অন্দর মহলে—সেখানে কেউ ঢুকতে পারে না। সেখানে গিয়ে খুব কড়া বিষ দিয়ে বানালো একটা আপেল। আপেলটা দেখতে হল ভারি চমৎকার। দেখলেই জিভ দিয়ে যেন জল পড়ে। কিন্তু তাতে এত বিষ যে এক টুকরো কেউ খেলেই নির্ঘাত মারা যাবে।

আপেল বানানো শেষ হতে রাণী সাজ-পোশাক বদলে সাজলো এক চাষী-বৌ-এর মত। তারপর সাত নদী সাত পাহাড় পেরিয়ে গেল সাত বামনের বাড়ি। সে দোরের কড়া নাড়তেই স্নো-হোয়াইট মাথা বাড়িয়ে বললে, "কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে আমার সাহস

হয় না। সাত বামন আমায় মানা করে গেছে।

বুড়ী কপাল চাপড়ে বললে, "হা আমার কপাল! আমায় শেষে আপেলগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে গো! যাক বাছা, একটা আপেল আমি তোমায় অমনিই দেবো।"

স্নো-হোয়াইট বললে, "না বাপু, ও আমার নিতে ভয় করছে।"

বুড়ী বললে, "ওমা, ভয় আবার কিসের! এই দেখো, আপেল আমি দু ভাগ করে কাটছি। আমি ভেতরটা খাচ্ছি; তুমি ওপরের লাল খোলাটি খাও।"

আপেলের খোলাটাতেই ছিল বিষ। আপেল দেখে স্নো-হোয়াইটের খেতে ভারি ইচ্ছে করছিল। বুড়ীকে আপেল খেতে দেখে সে আর লোভ সামলাতে পারল না। হাত বাড়িয়ে আপেলটা নিল। তারপর সেটা মুখে দিতে না দিতে মরে পড়ে গেল মেঝেতে।

তাই-না দেখে হিংসেয় হিহি করে হাসতে হাসতে রাণী বললে, "ওগো আমার বরফের মত সাদা, রক্তের মত লাল, মেঘবরণ-কেশ রাজকন্যে, এবার আর তোমায় সাত বামনেও জাগাতে পারবে না!"

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে রাণী আয়নাকে জিজ্ঞেস করল:

"আয়না, আমার আয়না,
সবার সেরা রূপবতী নামটি তার কওনা।"

আয়না বললে:

"তুমিই রাণী রূপবতী তুলনা তার হয় না।"

সেই কথা শুনে হিংসুটে রাণীর মন ঠাণ্ডা হল এতদিনে।

এদিকে সন্ধ্যা হল। সাত বামন বাড়ি ফিরে দেখল স্নো-হোয়াইট মড়ার মত পড়ে আছে মেঝেতে। প্রাণের কোন সাড়া আর তার নেই। তারা ওকে তুলে ধরল, পোশাক আলগা করে দিল, কোন বিযাক্ত কিছু পায় কিনা খুঁজল, চুলের বিনুনি খুলে দেখল, মুখে চোখে কত জলের ঝাপটা দিল। তবু কিছুতেই কিছু হল না। তাদের চোখের মণি মেয়েটা সত্যিই এবার মরে গেছে। তখন তারা আর কি করে! তাকে কফিনে শুইয়ে তার পাশে সকলে ঘিরে বসল। আর তিন দিন তিন রাত ধরে তারা কি কান্নাই যে কাঁদতে লাগল কি আর বলব!

এর পর কবর দিতে হবে। কিন্তু স্নো-হোয়াইটকে দেখলে যেন মনে হয় এখনও জীবন্ত। গালে লাল আভাটুকু এখনও লেগে রয়েছে। তখন তারা পরামর্শ করল, একে মাটিতে পোঁতা হবে না। তারা কাচের একটা বাক্স তৈরি করল। কাচের মধ্যে দিয়ে সব দিক থেকেই তাকে দেখা যাবে। কাচের বাক্সের গায়ে তারা স্নো-হোয়াইটের নাম লিখল; লিখল—এ ছিল এক রাজকন্যা। তারপর বাক্সে স্নো-হোয়াইটকে শুইয়ে এক পাহাড়ের পাশে রেখে দিল আর সব সময় একজন-না-একজন বাক্সের কাছে বসে পাহারা দিতে লাগল।

বনের পশুপাখীরা পর্যন্ত স্নো-হোয়াইটের জন্য শোক করতে লাগল।

সেই বাক্সের মধ্যে স্নো-হোয়াইট শুয়ে রইল। দেখলে মনে হয় বুঝি ঘুমুচ্ছে। তার দুধের মত রং, মেঘের মত কেশ—কিছুই বদলাল না।

কত দিন গেল, রাত গেল। শেষে একদিন এক রাজপুত্র এল সেখানে। সাত বামনের বাড়ি রাত কাটাতে কাটাতে দেখল সেই বাক্স, দেখল রাজকন্যাকে। বলল, "এই বাক্সটা তোমরা আমায় দাও। যা টাকাকড়ি তোমরা চাও আমি দেবো।"

সাত বামন বলল, "দুনিয়ার সব সোনা আমাদের দিলেও আমরা এটা বেচবো না।"

রাজপুত্র বললে, "তবে বাক্সটা তোমরা আমায় দান কর। স্নো-হোয়াইটকে না পেলে আমি বাঁচব না। যতদিন আমি বাঁচব স্নো-হোয়াইটকে আমি দেখব।"

তার মিনতি শুনে বামনদের দয়া হল। শেষে বাক্সটা তারা দিল রাজপুত্রকে। রাজপুত্র তার লোকজনকে হুকুম দিল বাক্সটা কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে।

কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ হল কি, লোকগুলো একটা পাথরে হোঁচট খেল। আর সেই ধাক্কায় স্নো-হোয়াইটের মুখের মধ্যে আপেলের যে টুকরোটা ছিল সেটা গেল পড়ে। অমনি স্নো-হোয়াইট চোখ খুলে বাক্সের ঢাকনা তুলে উঠে বসে বললে, "আমি কোথায় ?"

রাজপুত্রের তখন আনন্দ আর ধরে না। সে বললে. "তুমি আমার কাছে!—কোন ভয় নেই তোমার।" তারপর সে সব কথা খুলে বললে স্নো-হোয়াইটকে। বললে, "আমি তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। এখন চল তোমায় নিয়ে বাবার কাছে যাই।" স্নো-হোয়াইট রাজী হল। রাজবাড়িতে গিয়ে খুব ধুমধাম করে রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল।

এখন হয়েছে কি, বৌভাতের দিন রাজার বাড়িতে নেমন্তন্ন হয়েছিল স্নো-হোয়াইটের সৎমারও। রাণী সাজগোজ করে বেরুবার আগে তার মায়া-আয়নার কাছে গিয়ে বললে,

"আয়না, আমার আয়না,
সবার সেরা রূপবতী নামটি তার কও না।"

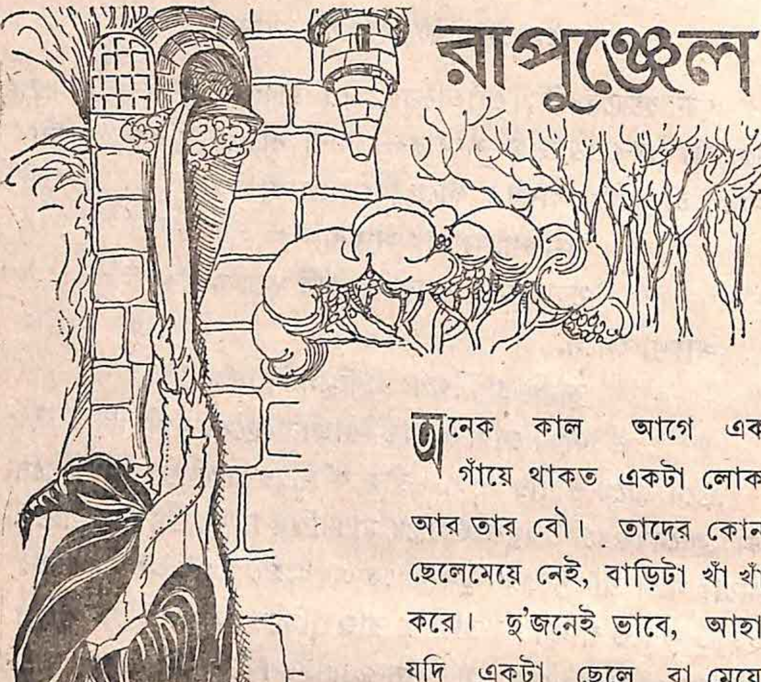
আয়না বললে,

তুমিই রাণী রূপবতী ছিলে আমি জানি।
এখন সেরা রূপবতী রাজার ছেলের রাণী।"

শুনে রাগে রাণীর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। প্রথমে সে ভাবলে নেমন্তন্নতে কিছুতেই যাবে না। কিন্তু হিংসে তো আর সহজে যাবার নয়। রাজপুত্রের নতুন বউকে একবার দেখবার জন্যে মন তার ছটফট করতে লাগল। তারপর রাজবাড়িতে গিয়ে চিনতে পারল এ আর কেউ নয়, এতো সেই স্নো-হোয়াইট। বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল রাণী। তার পা যেন জমে পাথর হয়ে গেল। তখন রাজপুত্রের হুকুমে চিমটেতে করে ধরে একজোড়া গনগনে গরম লোহার জুতো আনা হলো। সেই জুতো পরে সৎমাকে বাধ্য করা হল নাচতে। নাচতে নাচতে নাচতে নাচতে যতক্ষণ না সৎমা মল—ততক্ষণ নাচ আর কিছুতেই বন্ধ হল না।

———

# রাপুঞ্জেল



অনেক কাল আগে এক গাঁয়ে থাকত একটা লোক আর তার বৌ। তাদের কোন ছেলেমেয়ে নেই, বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। দু'জনেই ভাবে, আহা যদি একটা ছেলে বা মেয়ে থাকত!

তাদের বাড়ির পেছন দিকে ছিল ছোট্ট একটা জানালা। জানালা দিয়ে দেখা যেত একটা সুন্দর বাগান। বাগানে এত ফুল ফুটে থাকে, শাকসবজি হয়ে থাকে যে দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। বাগানের চারধারে খুব উঁচু পাঁচিল। পাঁচিল ডিঙিয়ে কেউ সেই বাগানে ঢুকতে সাহস করত না। কেন জান?

বাগানটা ছিল এক ডাইনীর। ডাইনীকে ভয় করত সারা পৃথিবীর লোক।

একদিন বৌটা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিল ডাইনীর বাগানটা। দেখতে দেখতে তার চোখে পড়ল বাগানের এক জায়গায় কি চমৎকার মুলো গাছ হয়ে রয়েছে। যতই দেখে ততই তার সেগুলো এনে খেতে ইচ্ছে করে। তারপর থেকে রোজই সেই মুলোশাক খাবার জন্যে বৌটার মন আকুলি-বিকুলি করে। কিন্তু সে শাক পাবার জো নেই। সে যে ডাইনীর বাগানের শাক। শেষে ভাবতে ভাবতে বৌটার অসুখ হল। যতই দিন যায় বৌটা রোগা হয়ে যায়, সাদা ফ্যাকাসে হয়ে যায় তার মুখ-চোখ।

ব্যাপার দেখে বর তো খুব ভয় পেলো। একদিন জিজ্ঞেস করলে, "হ্যা গা, কি হয়েছে তোমার ? শরীর এমন হচ্ছে কেন ?"

বৌ বললে, "বাড়ির পেছনের ঐ বাগানের মুলোশাক খেতে না পেলে আমি আর বাঁচবো না।"

বর ভাবল, "তাইতো, শেষে বৌ কি মরে যাবে! তার চেয়ে যা হয় হোক, মুলোশাক নিয়ে আসতেই হবে।"

এই-না ভেবে সন্ধ্যা হতেই সে পাঁচিল টপকে গেল ডাইনীর বাগানে। সেখান থেকে তাড়াতাড়ি কতকগুলো মুলোশাক নিয়ে এল। বৌ তাই দিয়ে তরকারি রেঁধে খেল খুব মজা করে। মুলো-শাকের তরকারি তার এত ভাল লাগল যে পরের দিন আবার কিছু শাক আনার জন্যে ধরল আবদার।

বর কি আর করে, সন্ধ্যা হতেই আবার ডাইনীর বাগানে যাবার জন্যে সে উঠতে লাগল পাঁচিলের উপর। একটু উঠেছে

এমন সময় দেখে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাইনী বুড়ী। ভয়ে তো তার হাত-পা ঠাণ্ডা হবার যোগাড়।

ডাইনী তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে, "কি! এত সাহস তোর? আমার বাগান থেকে চোরের মত মুলোশাক চুরি করা! এর ফল পেতে হবে তোকে, তা জানিস?"

লোকটা বললে, "দোহাই তোমার, এবারের মত মাফ কর। নেহাত দায়ে পড়ে এ কাজ করতে হয়েছে আমায়। তোমার বাগানের মুলোশাক দেখে আমার বৌ-এর খাবার ভারি লোভ হয়েছিল। ও শাক না খেলে সে বাঁচত না।"

ডাইনী বললে, "বটে! বেশ, তবে যত খুশি মুলোশাক তুই নিয়ে যা। তবে একটা শর্ত আছে। তোদের কোন ছেলেমেয়ে হলে আমায় দিতে হবে তাকে। আমি তাকে মায়ের মত যত্ন করে মানুষ করব।"

লোকটা প্রাণের দায়ে রাজী হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে লোকটার একটা মেয়ে হল। ডাইনীও ঠিক সেই সময় এসে মেয়েটাকে নিয়ে গেল। মেয়ের নাম দিল ডাইনী রাপুঞ্জেল।

দেখতে দেখতে রাপুঞ্জেল বড় হয়ে উঠল। তার মত সুন্দরী আর কেউ নেই। রাপুঞ্জেলের বয়েস বছর বারো হতেই ডাইনী বনের মধ্যে মস্ত উঁচু দুর্গের চূড়োয় তাকে আটকে রেখে দিল। সে দুর্গের চূড়োয় ওঠার না ছিল কোন সিঁড়ি, না কোন দরজা। শুধু উপরে ছিল একটা ছোট্ট জানালা।

ডাইনীর যখন সেই চূড়োর ঘরে ওঠার ইচ্ছে হত তখন সে নীচে দাঁড়িয়ে বলত :

"কেশবতী কন্যা তোমার কেশ নামিয়ে দাও।"

রাপুঞ্জেলের ছিল সুন্দর লম্বা কেশের রাশি। ডাইনীর ডাক শুনেই সে খোঁপা খুলে জানালা দিয়ে চুল ঝুলিয়ে দিত একেবারে নীচে। ডাইনী সেই কেশ ধরে ধরে উঠে যেত ওপরে।

কয়েক বছর এমনি করে কেটে গেল। একদিন এক রাজার ছেলে বেড়াতে বেড়াতে সেই বনে দুর্গের ধারে এল। সেখানে আসতেই সে শুনতে পেল কে যেন ভারি মিষ্টি গলায় গান গাইছে। গান শুনেই রাজপুত্র একেবারে মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই মিষ্টি সুরের গান গাইছিল রাপুঞ্জেল। একলা একলা ভাল না লাগলে সে নিজের মনে গান গেয়ে সময় কাটাত। রাজপুত্রের ইচ্ছা হল সেই গান কে গাইছে গিয়ে দেখে। কিন্তু চারদিক খুঁজেও সে দুর্গের উপরে ওঠার কোন দরজা দেখতে পেল না।

তখন আর কি করে, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল বাড়িতে। কিন্তু গান তার এত ভাল লেগেছিল যে রোজই সেখানে এসে সে গান শুনত একটা গাছের আড়াল থেকে।

একদিন রাজপুত্র গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় সে দেখল সেখানে এল এক ডাইনী। ডাইনী বললে :

"কেশবতী কন্যা তোমার কেশ নামিয়ে দাও।"

তখন রাপুঞ্জেল চুলের গোছা নামিয়ে দিল, আর ডাইনী উঠে গেল সেই চুল বেয়ে। রাজপুত্র নিজের মনেই বললে, "ও, এই

মই দিয়েই তাহলে উঠতে হয় দুর্গের চূড়োয়। যাক, আমিও এবার তাই করব।”

পরের দিন সেই দুর্গের কাছে এসে রাজপুত্র বললে ঃ

“কেশবতী কন্যা তোমার কেশ নামিয়ে দাও।”

অমনি চুলের গোছা নেমে এল ; রাজপুত্র তাই ধরে ধরে উঠে গেল উপরে।

একজন পুরুষ মানুষকে আসতে দেখে রাপুঞ্জেল প্রথমে ভয় পেয়ে গিছল। আগে আর কখনো পুরুষের মুখ দেখে নি তো সে। কিন্তু রাজপুত্র অনেক মিষ্টি কথা বলে ভয় ভাঙালো তার। রাজপুত্র বললে, “তোমার গান শুনে আমার এত ভাল লেগেছে যে তোমাকে চোখে না দেখে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না আমি।”

শেষে রাজপুত্র বললে, “আমায় তুমি বিয়ে করবে ?”

রাজপুত্র যুবা পুরুষ, দেখতেও চমৎকার। রাপুঞ্জেল ভাবলে, বুড়ী ডাইনীর হাতে পড়ে থাকার চেয়ে রাজপুত্রকে বিয়ে করা অনেক ভাল। তাই বললে, “হ্যাঁ, করব। তোমার সঙ্গে আমি নিশ্চয় যাবো। তবে আমি এখান থেকে নামতে জানি না। তুমি এবার থেকে যখন আসবে খানিকটা করে রেশম এনো। আমি তাই দিয়ে একটা মই বুনবো। মই বোনা শেষ হলে আমি তাই দিয়ে নীচে নেমে যাবো। তুমি আমায় ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে চলে যাবে। কেমন ?”

তখন তারা ঠিক করল তারা শুধু রাত্রেই দেখা করবে কারণ ডাইনী আসত দিনের বেলায়।

ডাইনী বুড়ী এই দেখা-সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল

না। কিন্তু একদিন হয়েছে কি, ভুলে রাপুঞ্জেল ডাইনীকে জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ মা, রাজার ছেলে এত সহজে আমার কাছে চলে আসে, তোমার আসতে এত কষ্ট হয় কেন ?"

ডাইনী বললে, "ওরে পাজী মেয়ে, আমি ভেবেছি আমি তোমায় সারা দুনিয়া থেকে আলাদা করে রেখেছি। তা না, তুমি আমায় ঠকিয়েছ ?"

রাগে রাপুঞ্জেলের চুলের মুঠি ধরে ডাইনী তাকে বেশ কয়েকটি ঘুষি লাগাল। তারপর একটা কাঁচি দিয়ে ক্যাচ ক্যাচ করে তার অমন সুন্দর চুলের গোছা দিল কেটে। তাতেও ডাইনীর রাগ গেল না। রাপুঞ্জেলকে নিয়ে সে রেখে এল এক মস্ত মরুভূমিতে।

তারপর রাপুঞ্জেলের চুলগুলো নিয়ে বিনুনি করে সে রেখে দিল। সন্ধ্যে হল। রাজপুত্র সেখানে এসে বললে,

"কেশবতী কন্যা তোমার কেশ নামিয়ে দাও।"

অমনি ডাইনী নামিয়ে দিল সেই বিনুনি। রাজপুত্র বিনুনি বেয়ে উপরে উঠে দেখে, রাপুঞ্জেল নেই, রয়েছে বুড়ী ডাইনী! ডাইনী কটমট করে রাজপুত্রের পানে তাকিয়ে বললে,

"বটে, বৌ নিতে এসেছ তুমি ? কিন্তু সে পাখী তো আর বাসায় বসে গান গাইবে না। বেড়ালে তাকে নিয়ে গেছে। এবার সেই বেড়াল তোমার চোখ উপড়োবে। রাপুঞ্জেল হারিয়ে গেছে চিরদিনের মত। তাকে আর তুমি কোনদিন দেখতে পাবে না।"

দুঃখে শোকে পাগলের মত হয়ে রাজপুত্র ঝাঁপ দিল সেই দুর্গের জানালা থেকে।

রাজপুত্র প্রাণে বেঁচে গেল—কিন্তু কাঁটা গাছের ঝোপে পড়ে

চোখ গেল অন্ধ হয়ে। অন্ধ হয়ে রাজপুত্র বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বনের ফলমূল খায় আর রাপুঞ্জেলের জন্যে কেঁদে ভাসায়।

ঘুরতে ঘুরতে মাস গেল, বছর গেল। শেষে রাজপুত্র এসে পৌঁছল সেই মরুভূমিতে যেখানে ছিল রাপুঞ্জেল। রাপুঞ্জেল তার যমজ ছেলে-মেয়ে নিয়ে ছিল সেখানে। হঠাৎ একটা চেনা গলার স্বর শুনে রাপুঞ্জেল এগিয়ে গেল সেদিকে! দেখল, এ তো সেই রাজপুত্র। রাজপুত্রের গলা জড়িয়ে ধরে অনেক চোখের জল ফেলল রাপুঞ্জেল। সেই চোখের জলের কয়েক ফোঁটা পড়ল রাজপুত্রের দু'চোখে। সেই জলে কেটে গেল তার চোখের ময়লা। আবার রাজপুত্র সব-কিছু দেখতে পেল।

তারপর রাজপুত্র বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে গেল নিজের রাজ্যে। সারা রাজ্যে সুখের বান ডাকল, মহাধুমধাম পড়ে গেল।

বুড়ী ডাইনীর যে কি হল তা কেউ জানে না।

---

# বীর রাজকুমার





এক ছিল রাজকুমার। রাজকুমারের বড় সাহস, ভয় কাকে বলে সে তা জানে না। ঘরে বসে বসে রাজকুমারের বড় এক-ঘেয়ে লাগে। একদিন রাজকুমার ভাবল, নাঃ, আর চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা চলে না। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে সারা দুনিয়ায় ঘুরতে, দুনিয়াকে দেখতে, নানান অদ্ভুত সব অ্যাডভেঞ্চারের মুখোমুখি হতে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিল রাজকুমার। তারপর বেরিয়ে পড়ল পথে, চলল যেদিকে দু-চোখ যায়, যে দিকে পা চলে; কোথায় চলেছে না চলেছে তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই।

আপেল গাছের ডালে ধরে আছে থরে থরে সোনার আপেল। আর সেই গাছকে ঘিরে আছে একটা শক্ত কঙ্কন। তার মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তবেই আপেল পাড়া যায়। এ পর্যন্ত কেউ তা পারে নি।”

রাজকুমার বললে, “তা হলে তো ভালই হল। তবে আমিই প্রথম গিয়ে আনব আপেল।”

তারপর দৈত্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলতে শুরু করল রাজকুমার। কত বন, কত মাঠ, কত পাহাড়, কত নদী পেরিয়ে শেষে রাজকুমার এসে পৌঁছল সেই মায়া কাননে। দেখল, দৈত্য যা বলেছিল সবই সত্যি। বাগানের রেলিং-এর ধারে শুয়ে ঘুমুচ্ছে নানান রকম বুনো জন্তু। তবে বুনো জন্তুগুলো সব বুড়ো হয়ে গেছে। রাজপুত্তুর তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, তাদের ঘুম ভাঙল না। রাজপুত্তুর তখন পাঁচিল ডিঙিয়ে নামল সেই বাগানের মধ্যে। বাগানের ঠিক মধ্যিখানে রয়েছে সেই জীওন-গাছ। আর তার ডালে ডালে ঝক্‌মক্ করছে সোনার আপেল।

রাজপুত্তুরের আনন্দ আর ধরে না। তাড়াতাড়ি গিয়ে সে উঠল গাছের ওপর। তখন দেখতে পেল সেই কঙ্কন। খুব সহজেই সেই কঙ্কনের মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে রাজপুত্তুর ছিঁড়ে নিল, সবচেয়ে ঝক্‌মকে, চকচকে আপেলটা। তারপর রাজপুত্তুর কঙ্কনের মধ্যে দিয়ে হাতটা বার করে নিতে গেল। কিন্তু কঙ্কনটা ততক্ষণে তার হাতে বেশ শক্ত করে এঁটে বসে গেছে। কঙ্কন হাতে জড়িয়ে যেতে রাজপুত্তুর অবাক হয়ে গেল। মনে হল তার গায়ের জোর যেন শতগুণে বেড়ে গেছে, তার শিরায় রক্ত যেন

ফুটছে টগবগ করে। আপেল হাতে নিয়ে গাছ থেকে নেমে রাজপুত্তুর তাকাতে লাগল এদিক ওদিক, চারিদিক।

পাঁচিল টপকে যেতে তার আর ইচ্ছে হল না। তাই সে গেল মস্তবড় ফটকটার কাছে। ফটক বন্ধ। রাজপুত্তুর খুব জোরে ধাক্কা দিতেই ঝনঝন করে খুলে গেল সে ফটক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝন্ ঝন্ শব্দে জেগে উঠল ফটকের ওপরের ঘুমন্ত সিংহটা। কিন্তু রাজপুত্তুর একটুও ভয় না পেয়ে এগিয়ে চলল। আর তার পিছু পিছু চলল সিংহটা। মনে হল সে যেন সিংহ নয়— একটা মস্ত বড় পোষা কুকুর—এমনি তার চলার ধরন।

তখন রাজপুত্তুর আবার গেল সেই দৈত্যের কাছে। বললে, "এই নাও জীওন-গাছের আপেল। আমি আমার কথামত— এটা এনে হাজির করেছি।"

দৈত্য তো মহাখুশী। আপেল নিয়ে সে হাজির হল বৌ-এর কাছে।

দৈত্যের বৌ দৈত্যের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। দেখতে তাকে ভারী সুন্দরী, বুদ্ধিও তার খুব।

দৈত্যের হাতে কঙ্কন বাঁধা নেই দেখে বৌ বললে, "কি গো, কঙ্কন কোথায় গেল? আপেল বুঝি তবে তুমি আনো নি? আপেল তাহলে পেলে কোথায়?"

দৈত্য বললে, "কি যে বল তার ঠিক নেই! আমি না আনলে আর দেবে কে? কঙ্কনটা আনতে ভুলে গেছি, গিয়ে আবার নিয়ে আসব।"

দৈত্য ভাবলে, রাজপুত্তুরের কাছ থেকে কঙ্কনটা সহজেই সে

আদায় করে নেবে। আপেল যখন রাজপুত্তুর দিয়েছে তখন আর কঙ্কন দিতে কি গররাজী হবে? সে তক্ষুনি রাজপুত্তুরের কাছে গিয়ে চাইল কঙ্কনটা।

কিন্তু রাজপুত্তুর কঙ্কন দিতে কিছুতেই রাজী হল না।

দৈত্য বললে, "দেখো বাপু, আপেল যে পাবে, কঙ্কনও থাকবে তার কাছে। কঙ্কন আমার চাইই। তুমি যদি না দাও আমি তবে লড়াই করব তোমার সঙ্গে।"

রাজপুত্তুর বললে, "বেশ তাই হোক।"

তারপর অনেকক্ষণ ধরে তুজনে চলল ধস্তাধস্তি মারামারি। কিন্তু দৈত্য কিছুতেই রাজপুত্তুরকে কাবু করতে পারল না। পারবে কি করে, রাজপুত্তুরের কাছে যে রয়েছে মায়া কঙ্কন। রাজ-পুত্তুরের গায়ে যে তাই হাতীর মত জোর হয়েছে। দৈত্য তখন ভাবলে না এভাবে লড়াই করে হবে না, তার চেয়ে চালাকি করে ওটা হাতাতে হবে।

এই না ভেবে দৈত্য বললে, "দেখো লড়াই করে আমরা তুজনেই হাঁপিয়ে পড়েছি। এখন এসো আগে নদীতে চান করে শরীরটা ঠাণ্ডা করে নিই।"

দৈত্য যে চালাকি করবে রাজপুত্তুর তা ভাবতেই পারে নি। নদীর পাড়ে গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে কঙ্কনটাও সে খুলে রাখল।

যেই না রাজপুত্তুর কঙ্কনটা খুলে মাটিতে রেখেছে অমনি দৈত্য সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে দিল এক ছুট।

কিন্তু সেই সিংহটা তখনও ছিল রাজপুত্তুরের কাছে কাছে। দৈত্যকে ছুটতে দেখেই সিংহ তাকে তাড়া করল। তারপর দৈত্যের

হাত কামড়ে ধরে, কঙ্কনটা কেড়ে নিয়ে, সিংহ আবার ফিরে এল রাজপুত্তুরের কাছে।

কিন্তু দৈত্য অত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। সে চুপি চুপি এসে লুকিয়ে রইল একটা গাছের আড়ালে। তারপর যেই না রাজকুমার চান করে উঠে জামা কাপড় পরতে গেছে অমনি দৈত্য তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে উপড়ে নিল তার চোখ দুটো। রাজকুমার তখন অন্ধ। দৈত্য তাকে নিয়ে একটা মস্ত উঁচু পাহাড়ের চূড়োর ওপর রেখে দিয়ে এল। দৈত্য ভাবলে, ঐ পাহাড়ের চূড়ো থেকে দু'পা এগুলেই নীচেয় পড়ে মরবে রাজপুত্তুর! তখন সহজেই ওর হাত থেকে কঙ্কন খুলে নেব।

কিন্তু সিংহের কথা ভুলে গেছল দৈত্য। দৈত্য পাহাড়ের চূড়ো থেকে নামতে না নামতেই সিংহ রাজকুমারের জামা কামড়ে ধরে তাকে নামিয়ে আনল নীচেতে।

তাই না দেখে রাগে দৈত্য দাঁত কড়মড় করতে করতে রাজপুত্তুরকে নিয়ে গেল আর এক পাহাড়ের চূড়োয়। রাজপুত্তুর এবার পড়ে মরে কিনা দেখবার জন্যে দৈত্য যেই না চূড়োর ধারে গেছে সিংহ অমনি তাকে মারল সজোরে এক ধাক্কা। দৈত্য এবার নিজেই পাহাড়ের ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে পড়ে একেবারে মরেই গেল।

সিংহ তখন রাজকুমারকে পিঠে করে নিয়ে গেল এক নদীর ধারে। এ নদীর জল পরিষ্কার ঝক ঝক করছে। সিংহ লেজে করে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিল রাজকুমারের দু'চোখে। দেখতে দেখতে রাজকুমারের চোখের দৃষ্টি আবার ফিরে এল।

রাজকুমার তখন আবার বেরিয়ে পড়ল সারা দুনিয়া ঘুরতে। সঙ্গে সঙ্গে চলল তার পোষা সিংহ। চলতে চলতে একদিন রাজকুমার এসে পৌঁছল এক দুর্গের সামনে। এ দুর্গের মালিক হল এক মায়াবী।

দুর্গের কাছে গিয়ে রাজকুমার দেখল, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। টানা টানা চোখ, সুশ্রী তার মুখ, বয়স অল্প। কিন্তু গায়ের রং বেশ কালো।

মেয়েটি বললে, "ওগো তুমি আমায় বাঁচাও। এক মায়াবী আমায় জাদু করে এখানে আটকে রেখেছে।"

রাজকুমার বললে, "তাই নাকি? তা আমায় কি করতে হবে বল।"

মেয়েটি বললে, "এই দুর্গে তোমায় তিন রাত্তির থাকতে হবে। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। তুমি যদি একটুও ভয় না পাও তবে আমি মুক্তি পাব, তোমারও কোন ক্ষতি হবে না।"

রাজকুমার দশ হাত বুক বিশ হাত করে বললে, "ভয় আমি কাউকে করি না। ভগবানের দয়ায়, সব বিপদের মুখোমুখি আমি হতে পারি।"

এই না বলে সে ঢুকে গেল দুর্গের একেবারে ভেতর। ক্রমে রাত হল। রাজকুমার দুর্গের দালানে বসে অপেক্ষা করতে লাগল কি ঘটে দেখবার জন্যে।

একটু একটু রাত বাড়ল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজল বারোটা। যেই না বারোটা বাজল অমনি চারদিক থেকে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল এক পাল ভূত প্রেত। প্রথমে রাজ-

কুমারের দিকে তাদের নজর-ই পড়ল না। দালানের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে তারা তাস খেলতে বসল।

তাস খেলতে খেলতে একটা ভূত হেরে যেতেই সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "এখানে একজন অচেনা লোক রয়েছে তাই হেরে গেছি আমি।"

তার কথা শেষ না হতেই রাজকুমারের দিকে সকলের চোখ পড়ল। তারা সব রাজকুমারকে ঘিরে ধরে ভয় দেখাতে লাগল নানারকম! কিন্তু রাজকুমার একটুও ভয় পেলো না, টু শব্দটি পর্যন্ত করল না। শেষে এক সময় ভোর হল, মোরগ ডাকল। তখন ভূত প্রেতগুলো সরে পড়ল সেখান থেকে।

ভূতগুলো চলে গেল। রাজকুমারের মনে হল, তার সারা অঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেছে। এমন সময় সেই মেয়েটি এল সেখানে। হাতে তার একটা কলসী। সেই কলসীতে ছিল জীওন নদীর জল। রাজকুমারের গায়ে সে সেই জল ছিটিয়ে দিল। আর অমনি রাজকুমারের শরীর যেন তাজা হয়ে উঠ্‌ল গায়ে ফিরে এল আগের মতই বল।

মেয়েটি বলল, "এক রাত্তির তো ভালোয় ভালোয় কাটল। কিন্তু এখন তো দু রাত্তির বাকি।"

এই না বলে মেয়েটি চলে গেল। রাজকুমার দেখল মেয়েটির পা দুটো যেন ফর্সা ধব ধব করছে এরই মধ্যে। পায়ের রঙ আর কালো নেই।

এর পর দু রাত্তির যে কি ভাবে কাটল তা আর বলার নয়। রাজকুমারকে মারার জন্যে ভূত প্রেতগুলো মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল।

কুমারের সারা অঙ্গ কেটে কুটে ছড়ে গেল তাদের অত্যাচারে। রাজকুমার কিছুতেই ভয় পায় না দেখে তাদের রাগ গেল আরো বেড়ে। তাদের দৌরাত্ম্যে মনে হল রাজকুমার বুঝি মরেই যাবে। তবু রাজকুমার একটুও ভয় পেল না, একটু কাঁপল না। শেষে তিন রাত্তির পোহাতেই তারা পালাল সেখান থেকে।

সেই মেয়েটি তখন এসে আবার জীওন নদীর জল ছিটিয়ে দিল রাজকুমারের গায়ে। রাজকুমারের গায়ে বল ফিরে এল, সোনার অঙ্গে ব্যথা গেল মরে, কাটা দাগ গেল মিলিয়ে।

আর রাজকুমার অবাক হয়ে দেখল মেয়েটির কালো রঙ্ কোথায় মিলিয়ে গেছে। এ যে দুধে-ধোয়া বরণ, আকাশের মত নীল চোখ, সোনালি সূর্যের আলোয় ঝলমলে সাত হাত কেশ।

রাজকুমারের অবাক-চোখের তারার দিকে চেয়ে মেয়েটি মিষ্টি হেসে বললে, "এসো রাজকুমার ফটকের সামনে তিনবার তোমার তরোয়ালটা ঘোরাও। তা হলেই এ মায়াপুরীর সকলেই মুক্তি পাবে!"

রাজকুমার মেয়েটির কথামত তিনবার তরোয়াল ঘোরাল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অবাক কাণ্ড! কোথায় সেই মেয়ে—এ যে এক রাজকন্যা! আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার লোক জন তার সখীরা। মায়াবীর মায়াতে এতদিন ছিল এরা বন্দী হয়ে।

তখন খুব ধুমধাম করে রাজপুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে হল সেই সোনার বরণ রাজকন্যার। আর একমাস ধরে চলল খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদ।

---